



আধুনিক ইতিহাস







পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত মাধ্যমিক
বিদ্যালয়সমূহের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক
Vide Notification No. TB/76/8/H/86 Dated 6.1.1977

আধুনিক ইতিহাস

(ভারত ও ভারতবাসী)

তৃতীয় খণ্ড

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায় বি. এ
পার্লামেণ্টের প্রাক্তন সদস্য
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, দিগড়ো মল্লিকহাটি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ,
ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

ও

শ্রীবাসুদেব ঘোষাল এম. এ., বি. টি., ডি. ই. এল. টি.
শিক্ষক, গড়বাটি উচ্চ বিদ্যালয়, চুঁচুড়া, হুগলী।

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশ করেছেন ঃ
সি. ভট্টাচার্য বি. এ. ; বি টি.
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৪

This book has been printed on paper allotted by Government of India at a concessional rate.

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৩
তৃতীয় পরিশোধিত সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য ঃ এগার টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

ছেপেছেন ঃ
শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল
দি গৌতম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে এই পুস্তকটি অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে পর্যায়টিকে এই শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এতদিন পর্যন্ত তাহাকে কিছুটা উপেক্ষাই করা হইত। আনন্দের কথা আমাদের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টির সঙ্গে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের পরিচিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে এই ইতিহাসটি পাঠ করিতে আকর্ষণ বোধ করে তাহার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা ও উপস্থাপনাকে বিষয় অনুযায়ী যথাসম্ভব সহজ ও সরল করিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়াছি। তবে পুস্তকটিকে আরও উন্নতমানের করিয়া তুলিবার জন্য সকল পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ও শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণের উপদেশ ও নির্দেশ আশা করি।

বর্তমানে প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে নূতন পদ্ধতি চালু করা হইতেছে। আমরা আমাদের শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া এই নূতন ব্যবস্থাকে পুস্তকটির রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পর্ষৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে আমরা বিষয়বস্তুকে একদিকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, অপরদিকে অনুশীলনীগুলিকে পর্ষতের নির্দেশ অনুসারে তৈয়ারি করিয়াছি। ছাত্রছাত্রীগণ দেশের ইতিহাস পাঠে এবং তাহাকে অনুধাবন করিবার কাজে যদি উৎসাহ বোধ করে, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বিনীত

শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবাসুদেব ঘোষাল

Objectives of Teaching History

The main objectives of teaching history will be :—

(1) To inculcate the love of the motherland, reverence for its past, and a belief in its future destiny as the home of a united cooperative society based on love, truth and justice.

(2) To awaken in the pupil a proper understanding of his social and geographical environment and an urge to improve it.

(3) To develop the basic concept of India as a land of unity in diversity and strengthen the growth of national solidarity.

(4) To broaden the pupil's mind so as to develop mutual respect for various religious and culture patterns.

(5) To imbibe and develop the individual and social virtues, that make a man a reliable associate and trusted neighbour.

(6) To develop a sense of the rights and responsibilities of citizenship and inspire a sense of pride and dignity in personal honesty.

Syllabus of History

(*Revised*)

for

CLASS VIII

		Pages
I.	Decline of Mughal Power after Aurangzeb : Rise of the Marathas under Sivaji—bid for empire under the Peshawas—Third Battle of Panipat···	12
II. (a)	Advent of the Europeans : The trade settlements : Anglo-French rivalry upto 1760 ···	10
(b)	Growth of English Power :	
(i)	Clive to Dalhousie : Nature of Resistance in Bengal—Alivardi, Sirajuddowla and Mir-kasem : Resistance in Mysore—Hyder Ali and Tipu Sultan—Resistance offered by the Marathas : Sikh resistance : Revolt of 1857—Abolition of East India Company ···	33
(ii)	Elgin to Curzon ···	5

(c) Reforms : Social, educational and administrative under Warren Hastings, Cornwallis ; Bentinck, Dalhousie, Ripon and Curzon ... 15

(d) India on a wider Canvas (in outlines). Her relation with Afganisthan, Bhutan, Tibet, Burma and Ceylon ... 10

III. History of Freedom Movement : Indian National Congress – W. C. Bonnerjea – Swadeshi Movement – Surendranath – Bepin Chandra – Aurobindo – B. G. Tilak – L. Lajpat Roy – Revolutionary Movement – Gandhiji's Non-Violent Non-Co-operation Movement – Deshbandhu Chittaranjan – Jawaharlal Nehru – Subhas Chandra Basu – Gandhiji's Civil Disobedience Movement – Khan Abdul Gafar Khan – Quit India Movement – Netaji's War against the British and formation of Azad Hind Government – British withdrawal – Independence ... 5

IV. Impact of important World Events during the period (1707-1947) on India and Her People – American War of Independence – French Revolution – The Industrial Revolution – League of Nations – Chinese Revolution – Second World War – The U. N. O.... 15

Text matter – 150 pages – Illustration etc. 15 pages, Total 165 pages, Pica type, Double Demy Size.

সূচীপত্র

আধুনিক ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মুঘল রাজশক্তির পতন

ঔরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ: মুঘল রাজশক্তির ধুরন্ধরদের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন ঔরংজেব। তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকালেই এই পতনের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। বিশাল সাম্রাজ্যের, বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় নানা জাতি ও ধর্মের প্রজাদের উপর রাজত্ব করিতে হইলে যে উদারতা, সহিষ্ণুতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয় ঔরংজেবের তাহা ছিল না। তাঁহার সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য অযথা কালক্ষেপ প্রভৃতি তাঁহার জীবদ্দশাতেই সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে যাহাতে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ আরম্ভ না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রদের সকলেই দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ফলে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হইল। অন্যতম পুত্র মোয়াজ্জম পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সাম্রাজ্য বিভক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অপর ভ্রাতারা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে প্রথমে আজম (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং পরে কামবক্স নিহত হইলেন। মোয়াজ্জম শেষ পর্যন্ত গৃহ-যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রথম বাহাদুর শাহ্ বা প্রথম শাহ্ আলম নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রথম বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মুঘল দরবারের অভিজাতগণ তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 'সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্তগণ "তুরানী" এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তগণ "ইরানী" নামে পরিচিত ছিল। অভিজাত হিন্দু, মুসলমান, জাঠ, রাজপুত রাজকর্মচারিগণ ছিলেন "হিন্দুস্থানী" দল নামে পরিচিত। তুরানীদের দলপতি ছিলেন নিজাম-উল মুল্‌ক্, ইরানীদের দলপতি ছিলেন জুলফিকার আলী। সৈয়দ হুসেন আলী এবং তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা ছিলেন হিন্দুস্থানী দলের নেতা। হিন্দুস্থানীরা ছিল তুরানী ও ইরানীদের বিরোধী।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র জাহান্দার শাহ্ অপর তিন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার খান। এক বৎসরের

মধ্যেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখ-সিয়ার সিংহাসন দখল করিলেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। তাঁহার পশ্চাতে হিন্দুস্থানী দলের সমর্থন ছিল। হিন্দুস্থানী দলের দুই নেতার একজন সৈয়দ হুসেন আলী হইলেন তাঁহার প্রধান সেনাপতি এবং অপরজন সৈয়দ আবদুল্লা হইলেন প্রধান মন্ত্রী। এই দুইজনের চেষ্টায় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফররুখ-সিয়ারকে তাঁহাদের হাতের পুতুলে পরিণত করিলেন। ফররুখ-সিয়ার ছিলেন দুর্বল, ভীরু ও নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ন্যায় অথবা অন্যায় কোনরূপ কার্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হইল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী আমিরের প্রভাবে তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়া ফররুখ-সিয়ার সিংহাসন-চ্যুত হইলেন (১৭১৯ খ্রী)। তাঁহাকে প্রথমে অন্ধ করিয়া পরে হত্যা করা হইল। ফরুরুখ-সিয়ার-এর রাজত্বকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বিনাশুল্কে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ।



নাদির শাহ্

ফরুরুখ-সিয়ারের মৃত্যুর পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বাহাদুর শাহের অন্যতম পুত্র রফি-উস্-শানের দুই পুত্র রফি-উদ্-দরাজাত এবং রফি-উদ্-দৌলাকে পরপর সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ ভ্রাতাদের বন্দীস্বরূপ ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের মৃত্যু হইলে সৈয়দ ভ্রাতাদের সাহায্যে মহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহম্মদ শাহ্ পূর্ববর্তী সম্রাটদের ন্যায় দুর্বল ছিলেন না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে দমন করিবার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজাম-উল-মুল্‌ক আসফজার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় উভয়েই নিহত হইলেন। অতঃপর আসফজা মহম্মদ শাহের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। আসফজা ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তাঁহার কার্যে মহম্মদ শাহ্ হস্তক্ষেপ করিলে তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান এবং প্রায় স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে থাকেন।

মহম্মদ শাহ্ ছিলেন দুর্বল শাসক। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে বাংলার শুবাদার আলিবর্দি খাঁ, অযোধ্যার শাসক সফ্দর জঙ্গ, আগ্রার জাটগণ এবং রোহিলখণ্ডের রোহিলাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং শিখগণ পাঞ্জাবে সক্রিয় হইয়া উঠিল। পেশওয়া প্রথম বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল (১৭৩৭ খ্রীঃ)। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া পারস্যের নাদির শাহ্ এবং আহম্মদশাহ্ আবদালী বা দুররানী ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যকে চরম আঘাত হানিল।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৪৮ খ্রীঃ)। কিন্তু বিধ্বস্ত মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত বা পুনঃসঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রী গাজি-উদ্-দিন (ইমাদ্-উল্-মুল্ক) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। জাহান্দার শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি ধারণ করিয়া বাদশাহ হইয়া বসিলেন। এই সময়েই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ কোম্পানী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইল। গাজি-উদ্-দিনের চক্রান্তে দ্বিতীয় আলমগীর নিহত হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শাহ্ আলম বাদশাহ্ হইলেন। কিন্তু গাজি-উদ্-দিনের ভয়ে তাঁহাকে প্রথমে মারাঠাদের এবং পরে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার পর দিল্লীর বাদশাহ্ হন দ্বিতীয় আকবর শাহ্ (১৮০৬-৩৭ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-৫৭ খ্রীঃ)। তাঁহারা নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন। বাহাদুর শাহের আমলেই মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ) ঘটে। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। এইজন্য বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংরেজগণ তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। সেখানে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মুঘল বাদশাহী লোপ পায়।

এইভাবে ঔরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের অক্ষমতা প্রদর্শন ও সিংহাসনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ: স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক সাম্রাজ্যেরই পতন হইয়া থাকে। কোন সাম্রাজ্য স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, কোনটি বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। একদা বিশাল ও শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য কালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বহুবিধ কারণ ছিল। কেবলমাত্র বহিরাক্রমণের

ফলে এই সাম্রাজ্যের পতন হয় নাই। বস্তুতঃ অভ্যন্তরীণ কারণে পতনোন্মুখ এই সাম্রাজ্যটি বহিরাক্রমণের ধাক্কায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম কারণ প্রজাদের আনুগত্যের অভাব। প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্য ভিন্ন কোন সাম্রাজ্য টিকিয়া থাকিতে পারে না। বিভিন্ন জাতিধর্ম অধ্যুষিত ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী ছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে একমাত্র আকবর ব্যতীত অপর কেহই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেব পর্যন্ত সম্রাটগণ সমরনিপুণ ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটগণ ছিলেন দুর্বল ও ব্যক্তিত্ব-বিহীন। তাই তাঁহাদের সময়ে সাম্রাজ্যটি দ্রুত ভাঙনের পথে অগ্রসর হয়।

সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশূর, পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করা সে যুগে সহজ ছিল না। বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের সহিত দ্রুত সংযোগ সাধন, কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দ্রুত কার্যকর করা সেই যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্ভব ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের উপর মুঘল বাদশাহের প্রাধান্য সমপরিমাণে বজায় রাখা সম্ভব হইত না। সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলি সুযোগ পাইলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। তাঁহাদের মতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলি ধ্বংস করা না হইলে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির উত্থান সম্ভব হইত না। ঔরংজেবের রাজত্বের শেষ পঁচিশ বৎসর সুলতানী রাজ্যগুলি এবং মারাঠাদের দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। দীর্ঘকাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে এবং সৈন্যদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। তিনি দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে বা মারাঠাদিগকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষতই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বিশিষ্ট কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আকবরের উদার পরধর্মসহিষ্ণু এবং সমব্যবহারের নীতি শাহ্‌জাহানের আমলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ঔরংজেবের সময় চরম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নীতি অনুসৃত হইল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি একইরূপ ব্যবহার করিয়া সকল ভারতবাসীর আনুগত্যলাভের প্রয়োজনীয়তা আকবর ভিন্ন অপর কোন সম্রাট উপলব্ধি করেন নাই। ফলে তাঁহারা শুধু মুসলমানদের সম্রাট

হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। ঔরংজেবের ধর্মান্ধ নীতির ফলে কেবলমাত্র হিন্দু, জাঠ, সৎনামী, রাজপুত এবং শিখগণ বিদ্রোহ করে নাই, সুন্নী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানগণও তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল।



আমির ওমরাহদের পরস্পর বাদ-বিসংবাদ, তাহাদের স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতা-লিপ্সা শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্ষমতালিপ্সু উজির বা প্রধানমন্ত্রীরা ক্ষমতার লোভে বাদশাহদের প্রাণনাশ পর্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের ভিৎ ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িত।

সম্রাট হইতে আমির ওমরাহ, সেনাপতি এবং সৈনিক পর্যন্ত সকল শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা, মদ্যাসক্তি ও দুর্নীতি সাম্রাজ্যের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। সৈন্যবাহিনীতে দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ লোপ পাইল এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহারা হারাইয়া ফেলিল।

ঔরংজেবের সময় পর্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায় ততটা কর্তৃত্বপরায়ণ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু পরে তাহাদের ক্ষমতা-লিপ্সা ও দলাদলি মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী এই তিন দল বাদশাহের উপর প্রভাব খাটাইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিল এবং শাসনকার্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ করিয়া সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়া তুলিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের শেষ পর্বে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করিয়া চরম আঘাত হানিলেন। এই আঘাত সহ্য করিয়া সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত করার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। এইভাবে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন আহম্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণে তাহা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল। ইহার পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ নামে মাত্র সম্রাট রহিলেন। এইভাবে ভিতরের দুর্বলতা এবং বাহিরের আক্রমণের মুখে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন সংঘটিত হইল।

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের ভূমিকাকে অনেক সময় সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। মুসলিম শাসনের পর ব্রিটিশরাজ ইহাই হইল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু ইংরেজ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের আগে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল মারাঠাদের হাতেই এবং মারাঠাশক্তিকে পরাজিত করার পরেই ইংরেজরা ভারতের শাসক হইয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজীর নেতৃত্বে প্রথম মারাঠাদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়। মারাঠাদিগকে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে শিবাজীর অবদান প্রধান হইলেও ইহার মূলে অন্যান্য নানা কারণ বিদ্যমান।

পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত। সহ্যাদ্রি, সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসঙ্কুল ও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। পর্বত, নদী ও সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত মহারাষ্ট্র দেশের অনুর্বর ও পর্বতসঙ্কুল জমি এখানকার অধিবাসীদের পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু করিয়াছে। একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণের ভক্তিধর্ম ও সাম্যের বাণী মারাঠাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণা দিয়াছিল। এক ভাষা ও সাহিত্য তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের নিকট পরিচিত ছিল এবং ঐসব সুলতানদের রাজ্যে সামরিক পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। এই পটভূমিকায় শিবাজীর নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রতিভা মারাঠাগণকে এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তিতে পরিণত করিল।

শিবাজী

শিবাজীর জন্ম ও বাল্যজীবন : জুনারের নিকট শিবনারের পার্বত্য দুর্গে শিবাজী ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬২৭ বা ১৬২৯ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে আহম্মদনগর ও পরে বিজাপুরে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতা জীজাবাঈ ছিলেন দেবগিরির জায়গীরদার যাদব রাও-এর কন্যা। পিতা শাহজী দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈ সহ বিজাপুরে থাকিতেন। শিবাজী বাল্যকালে মাতা জীজাবাঈ ও দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুণায় থাকিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের কাহিনী শিবাজীকে তেজস্বী ও হিন্দুধর্মের আদর্শের অনুরাগী করিয়া তোলে।



শিবাজী

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে শিবাজী তাহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে তোর্ণা দখল করিয়া লইলেন। ইহার পর রায়গড় নামে অপর একটি দুর্গও তিনি অধিকার করিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেবের আপত্তিতে তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর শিবাজী আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করিলেন। কল্যাণ দুর্গটি দখল করিলে বিজাপুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। বাধ্য হইয়া শিবাজী পরবর্তী কয়েক বৎসর আক্রমণাত্মক নীতি ত্যাগ করেন এবং শাহজী মুক্তিলাভ করেন।

শিবাজী-ঔরংজেব সংঘর্ষ : ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শিবাজী বিজাপুরের অধীন জাওলী রাজ্যের মারাঠা শাসনকর্তাকে হত্যা করিয়া রাজ্যটি দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি মুঘলদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের আহমদনগর ও জুনার লুণ্ঠন করিলে ঔরংজেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিলেন। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দিল্লী চলিয়া গেলে শিবাজী পুনরায় আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়া বিজাপুরের কয়েকটি অঞ্চল দখল করিলেন।

শিবাজীর শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান সেনাপতি

আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলে আফজল খাঁ উহা দখল করিতে ব্যর্থ হইলেন। আফজল খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং আলোচনার সময় শিবাজীকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিলেন। শিবাজী ইহা জানিতে পারিয়া প্রস্তুত হইয়া আফজল খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আফজল তাঁহাকে আলিঙ্গনের ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী 'বাঘনখ' নামে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁকে হত্যা করিলেন। ইহার ফলে আফজলের সেনাবাহিনী ভীত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শিবাজী তাহাদের সহজেই পরাজিত করিয়া দক্ষিণ কোঙ্কণ ও কোলাপুর অধিকার করিয়া লইলেন (১৬৬০ খ্রীঃ)। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে পরপর কয়েকটি অভিযান পাঠাইয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিলেন।

আফজল খাঁর হত্যার পর ঔরংজেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শায়েস্তা খাঁ পুণা, চাকান ও কল্যাণ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু শিবাজী এক রাত্রিতে শায়েস্তা খাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া শায়েস্তা খাঁর পুত্র এবং দেহরক্ষীদের হত্যা করিলেন। শায়েস্তা খাঁ পলাইতে গিয়া শিবাজীর তরবারির আঘাতে হাতের একটি আঙ্গুল হারাইলেন। পর বৎসর শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিলেন।

ঔরংজেব এইবার জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শিবাজী পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। ইহা পুরন্দরের সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজী ২৩টি দুর্গ ও কয়েকটি জিলা মুঘলদের ছাড়িয়া দিয়া ২১টি দুর্গ নিজ অধিকারে রাখিলেন। ইহা ভিন্ন প্রয়োজনবোধে মুঘল সম্রাটকে সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর যখন মুঘল শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইল তখন শিবাজী সত্যই সামরিক সাহায্য দিলেন। ঔরংজেব শিবাজীকে মুঘল দরবারে আমন্ত্রণ জানাইলেন। জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী পুত্র শম্ভুজী সহ আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান না দেখাইয়া ঔরংজেব তাঁহাকে মাত্র পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদমর্যাদা দিলেন। শিবাজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং প্রতিবাদ জানাইলেন। ঔরংজেব তাঁহাকে সপুত্র বন্দী করিলেন। শিবাজী অসুখের ভান করিয়া সুকৌশলে পুত্র শম্ভুজী সহ পলাইয়া গেলেন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পরবর্তী তিন বৎসর মুঘলদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হইয়া শিবাজী শাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও নিজের শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ঔরংজেব শিবাজীকে রাজা উপাধি এবং বেরারের জায়গীর দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে (১৬৭০ খ্রীঃ) পুনরায় মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। শিবাজী পুরন্দরের সন্ধি অনুযায়ী যে সকল দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন একে একে সেগুলি দখল করিয়া লইলেন এবং সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। বারংবার মুঘলদের পরাজিত করিয়া তিনি সুরাট বন্দরের উপর চৌথ দাবি করিলেন (১৬৭২ খ্রীঃ)।

শিবাজীর অভিষেক : ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে মহাসমারোহে শিবাজীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল এবং তিনি "ছত্রপতি," "গো-ব্রাহ্মণ প্রজাপালক" উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পর বৎসর গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া জিঞ্জি, ভেলোর এবং মহীশূরের একাংশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া এক বিস্তীর্ণ মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী আকস্মিক-ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য উত্তরে সুরাটের নিকট ধর্মপুর হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শিবাজীর কৃতিত্ব : ভারতের ইতিহাসে শিবাজী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছেন। তিনি কেবলমাত্র দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও অসাধারণ সংগঠকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক, পরধর্মসহিষ্ণু এবং মহান আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁহার প্রেরণায় জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত মারাঠা জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কাফি খাঁ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক স্মিথ শিবাজীর বিরুদ্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মন্তব্যগুলি সঠিক নয়। শিবাজী কখনও অযথা রক্তক্ষয় করেন নাই। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না বা দস্যুও ছিলেন না। তিনি ছিলেন কূটনৈতিক ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী, হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদার ও বীর। যুদ্ধ-কালেও তিনি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান হাতে পড়িলে উহা মুসলমানদের হাতে ফিরাইয়া দিতেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সেনাবাহিনী যাহাতে যুদ্ধকালে শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের প্রতি কোন অত্যাচার না করে সেদিকে শিবাজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা : বিখ্যাত সমরকুশলী যোদ্ধার ন্যায় শিবাজী একজন দক্ষ শাসকও ছিলেন। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বে-সর্বা। শাসনকার্যে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য "অষ্টপ্রধান" বা আটজন মন্ত্রী লইয়া গঠিত একটি পরিষদ ছিল। প্রধানমন্ত্রী বা পেশওয়াকে রাজ্যের প্রজাদের মঙ্গলের দিকে নজর রাখিতে হইত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য

সমগ্র রাজ্যকে ৪টি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি প্রান্ত কয়েকটি পরগণা বা তরফে এবং প্রতিটি তরফ গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনভার ছিল গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল একজন রাজপ্রতিনিধির উপর। তাঁহাকে আটজন কর্মচারীর একটি পরিষদ সাহায্য করিত। কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্যের তদারকি করিতেন দেশমুখ্য বা দেশপাণ্ডে নামক কর্মচারীরা।

শিবাজী জায়গীর প্রথা তুলিয়া দিয়া সরাসরি প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের উৎপন্ন ফসলের ত্রিশ শতাংশ বা পরবর্তিকালে চল্লিশ শতাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। শিবাজী পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী নামক (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ) দুই প্রকারের কর আদায় করিতেন। এইগুলি দিলে ঐসব দেশের উপর মারাঠা সৈন্যরা আক্রমণ বা লুণ্ঠন করিত না।

শিবাজীর সৈন্যবাহিনী অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া গঠিত ছিল। অশ্বারোহী-বাহিনী আবার দুইভাগে বিভক্ত ছিল—'বার্গীর' ও 'শিলাদার'। 'বার্গীর' সরকার হইতে মাহিনা পাইত এবং 'শিলাদার' নিজের যাবতীয় যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিজেই ব্যবস্থা করিত। অশ্বারোহী ও পদাতিক ছাড়াও শিবাজীর একটি নৌবাহিনীও ছিল। শিবাজীর দুর্গগুলি সামরিক ব্যবস্থার প্রধানতম অঙ্গ ছিল। মৃত্যুর সময় শিবাজীর অধীনে ২৪০টি দুর্গ ছিল। শিবাজীর সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল সেনাবাহিনার মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। শিবাজীর সামরিক সাফল্যের অপর একটি কারণ ছিল 'গেরিলা যুদ্ধনীতি'। মহারাষ্ট্রের ন্যায় পর্বতসঙ্কুল দেশে এই রীতি খুবই কার্যকরী হইয়াছিল।

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা মুঘল শাসনব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে "শিবাজী যে শুধু মারাঠা জাতির স্রষ্টা ছিলেন এমন নহে, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা সম্পন্ন স্রষ্টা।" তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মারাঠারা এক সঙ্ঘবদ্ধ, দুর্ধর্ষ এবং জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ : শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৬৮০ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় সমরকুশলী ও প্রতিভাবান না হইলেও তিনি সাহসী ছিলেন। ঔরংজেবের পুত্র আকবর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য শম্ভুজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শম্ভুজী সেই অভাবনীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে

পরাজিত করিয়া শম্ভুজীকে আক্রমণ করেন। শম্ভুজী মুঘলদের হস্তে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন এবং পুত্র শাহুও বন্দী হইলেন। শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারামের নেতৃত্বে মারাঠাগণ প্রতিরোধ চালাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মুঘলদের হাত হইতে তাহাদের দুর্গগুলি একে একে পুনর্দখল করিতে লাগিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই বিধবা পত্নী প্রথমে নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত মারাঠাবাহিনীর সাহায্যে প্রথমা পত্নী তারাবাঈ নিজ শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মারাঠা শক্তি দমনের জন্য ঔরংজেবের সকল প্রচেষ্টা মারাঠাগণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ঔরংজেব ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন (১৭০৭ খ্রীঃ)।

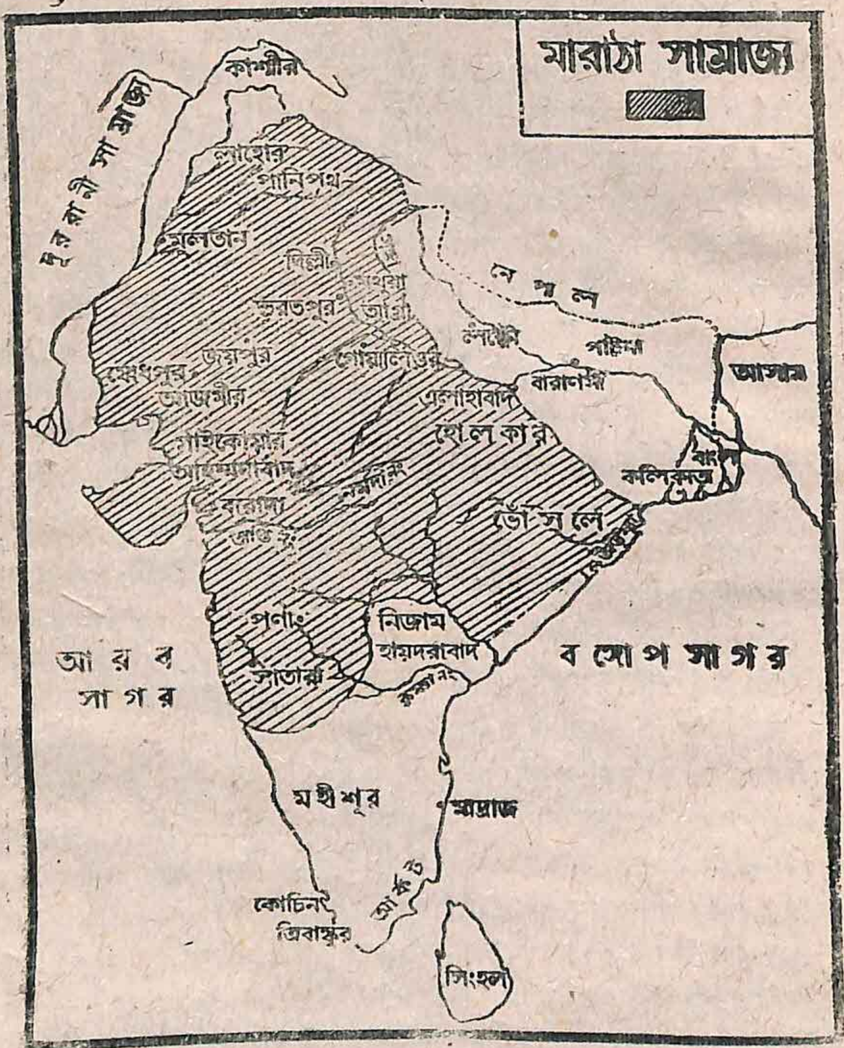
ঔরংজেবের মৃত্যুর পর শম্ভুজীর পুত্র শাহু মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শাহু জয়লাভ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর (দ্বিতীয় শিবাজী) প্রধানমন্ত্রী বা পেশওয়া নিযুক্ত হইলেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ণার সন্ধির দ্বারা মারাঠা গৃহবিবাদের অবসান হইল। দ্বিতীয় শম্ভুজী ও শাহুর (দ্বিতীয় শিবাজী) রাজ্য সুনির্দিষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রে শাহুর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল এবং দ্বিতীয় শম্ভুজী কোলাপুরের রাজারূপে স্বীকৃত হইলেন।

পেশওয়াতন্ত্রের উৎপত্তি

শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার পেশওয়া (১৭১৩-২০ খ্রীঃ) অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাঁহার দূরদর্শিতা, শাসনদক্ষতা ও সংগঠনী ক্ষমতা মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ শাহুর শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ক্ষমতা তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে তিনি পেশওয়া পদটিকে বংশানুক্রমিক করিয়া তুলিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা শাসনব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সংগঠিত করিলেন। মারাঠা জায়গীরদারদের চৌথ ও সরদেশমুখীর ভাগ দিয়া তিনি তাহাদের সমর্থন নিশ্চিত করিলেন। চৌথ হইতে যে অর্থাগম হইত তাহার এক-চতুর্থাংশ পাইতেন রাজা এবং অবশিষ্ট অংশ পাইতেন মারাঠা সর্দারগণ। সরদেশমুখীর সকল অর্থই রাজা পাইতেন। ১৭১৪

খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধির দ্বারা মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকারের বিনিময়ে মুঘল অধিকৃত সকল অংশ শাহু ফিরিয়া পাইলেন। বালাজী বিশ্বনাথের পরামর্শে স্বাক্ষরিত এই সন্ধি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনে এবং মুঘল দরবারে মারাঠাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিল।



১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশওয়া (১৭২০-৪০ খ্রীঃ) হইলেন। পেশওয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন সমরকুশলী ও সুচতুর কূটনীতিবিদ। তাঁহার আদর্শ ছিল সর্বভারতীয়

এক হিন্দু সাম্রাজ্য (হিন্দু-পাদ-পাদশাহী) স্থাপন করা। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রথম বাজীরাও হিন্দুরাজগণ, অভিজাত শ্রেণী ও দলপতিদের সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন।

প্রথম বাজীরাও জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ ও বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারে ভীত হইয়া মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ হায়দ্রাবাদের নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিজাম মারাঠাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন। এই জয়ের ফলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। ইহার পর বাজীরাও পশ্চিম উপকূলে সল্‌সেট ও বেসিন বন্দর হইতে পর্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইল।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **বালাজী বাজীরাও** পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি নানাসাহেব নামে অধিক পরিচিত হন। ছত্রপতি শাহু একটি দলিলে পেশওয়াকে মারাঠা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করেন এবং শিবাজীর বংশধরদের রাজপদে অধিষ্ঠিত রাখেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে পেশওয়া মারাঠা রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। বালাজী বাজীরাও পিতার ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পিতার নীতি হইতে বিচ্যুত হন। হিন্দু পাদ-পাদশাহীর আদর্শ ত্যাগ করিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে উৎপীড়ন চালাইলেন। ফলে উত্তর ভারতের হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে তিনি অন্য জাতি ও ধর্মের লোক গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতীয়তাবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং মারাঠা যুদ্ধনীতিতে পরিবর্তন আনেন।

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজামকে পরাজিত করিয়া ৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেন এবং আহমদনগর, বুরহানপুর, দৌলতাবাদ ও বিজাপুর লাভ করেন। বেরারের ভোঁসলে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে চৌথ আদায় করেন ও উড়িষ্যা জয় করেন।

পেশওয়ার সৈন্যদল রঘুনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে (১৭৫৮ খ্রীঃ) উত্তর ভারতেও অভিযান করে। এই সময়ে আফগানিস্তানের সুলতান আহম্মদ শাহ্ আবদালী দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া-

ছিলেন। মারাঠারা আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া মুঘল সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং আফগানদের নিকট হইতে পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্ আবদালী পাঞ্জাব উদ্ধারের জন্য ভারত আক্রমণ করিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালীর হস্তে মারাঠাগণ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইল। বালাজী বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই আঘাতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে ব্যর্থ হইয়া গেল। মারাঠা শক্তির দুর্বলতার ফলে ভারতে ইংরেজ শাসন স্থাপনের পথ সুগম হইল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) :

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(i) ... রাজত্বকালে মুঘলদরবারের অভিজাতগণ তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (ii) মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে পারস্যের ... ভারত আক্রমণ করেন।

(iii) ঔরংজেবের ... ও ধর্মান্ধ নীতি উহার ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

(iv) ... ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন এবং আহম্মদ শাহ্ আবদালীর পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ ... সাম্রাজ্যকে চরম আঘাত হানিয়াছিল।

(v) শিবাজীর পরিবারের অভিভাবক ছিলেন ...।

2. সঠিক উত্তর টিক (✓) দিয়া বুঝাইয়া দাও :

(i) ফারুকশিয়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন ১৭১১ □ / ১৭৬১ □ / ১৭১৭ □ / ১৭৭১ □ / খ্রীষ্টাব্দে

(ii) সরদেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থই পাইতেন

মারাঠা সর্দাররা □ / মারাঠা রাজারা □ / মারাঠা মন্ত্রীরা □।

(iii) "হিন্দু-পাদ-পাদশাহী" নামে একটি হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন বালাজী বিশ্বনাথ □ / প্রথম বাজীরাও □ / শাহু □।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) :

1. ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্বন্ধে কি জান ?
2. শিবাজীর আবির্ভাবের সময় মারাঠা জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল ?
3. শিবাজীর সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে কি জান ?
4. শিবাজীর শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?
5. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরংজেব কতদূর দায়ী ছিলেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay Type Questions) :

1. ঔরংজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের সম্বন্ধে কি জান ?
2. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।
3. মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা কর।
4. মারাঠা জাতির স্রষ্টা শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।
5. পেশওয়াদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ? পেশওয়াদের কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয়দের আগমন

ইউরোপীয় বণিকগণ—তাহাদের বাণিজ্য-কুঠী : ভারতবর্ষের সঙ্গে বহু প্রাচীন কাল হইতে ইউরোপের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। রোম ও গ্রীসের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ও দূতবিনিময়ের কথা সকলেরই জানা আছে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে আরব নাবিকদের আধিপত্য স্থাপিত হইলে ভারতের সমুদ্রবাহী বাণিজ্য তাহাদের হাতে চলিয়া যায়। সেই সময়ে ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া প্রভৃতি শহরের বণিকেরা আরবদের নিকট হইতে ভারতীয় পণ্য কিনিয়া লইয়া ইউরোপের অপরাপর দেশে চালান দিত। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ-ভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে জলপথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। পর্তুগাল এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে।

পর্তুগীজ বণিকগণ : পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলে ভারতের সহিত ইউরোপের প্রত্যক্ষ সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়। ইহার পর পর্তুগীজ বণিকগণ কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কালিকটে তখন আরব বণিকেরা ব্যবসাবাণিজ্য চালাইত। আরব বণিকদিগকে বিতাড়িত করিয়া বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ বণিক-গণ আরবদের সহিত দ্বন্দ্ব শুরু করিল। পর্তুগীজগণ কালিকটের হিন্দু রাজা 'জামোরিন'-এর বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিনের হিন্দুরাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহারা কোচিন ও ক্যানানোর নামক স্থানে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিল। এইসব বাণিজ্য কুঠী তদারক করিবার জন্য প্রতি বৎসর একজন করিয়া গভর্নর পর্তুগাল হইতে আসিতে লাগিলেন। ১৫০৯



ভাস্কো-ডা-গামা

খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। ভারতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপনে তাঁহার অবদান সমধিক। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজাপুর রাজ্য হইতে গোয়া বন্দরটি দখল করিয়া নিলেন। ছলে, বলে, কৌশলে তিনি স্থানীয় রাজাদের উপর পর্তুগীজ আধিপত্য স্থাপন করেন। বলপ্রয়োগে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে পর্তুগীজরা ছিল অত্যন্ত উৎসাহী। ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজরা সুরাট, দমন, বেসিন, সালসেট, বোম্বাই, গোয়া, কালিকট, কোচিন, কুইলন, কলম্বো, মসলিপত্তন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে। পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ায় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার (St. Xavier) আসিয়াছিলেন এবং সেখানেই তিনি ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পর্তুগীজ শক্তি ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার পর হইতে তাহাদের পতন শুরু হয়। বিজাপুর, মারাঠা এবং মুঘলশক্তির প্রতিকূলতার ধাক্কা সামলানো তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ভিন্ন অপরাপর সকল স্থান হইতে তাহারা বিতাড়িত হয় ইউরোপে ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে বিফল হওয়ায় ভারতেও পর্তুগীজরা কোণঠাসা হইয়া পড়িল

ওলন্দাজ বণিকগণ : ভারতবর্ষ হইতে পর্তুগীজ শক্তিকে বিতাড়নে প্রধান ভূমিকা ছিল ওলন্দাজ বা ডাচদের। প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী ওলন্দাজদের সঙ্গে পর্তুগীজদের পূর্ব হইতেই ধর্মীয় বিরোধ ছিল। ক্যাথলিক পর্তুগীজ শক্তিকে ধ্বংস করা এবং প্রাচ্যদেশে উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ওলন্দাজগণ প্রথমে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও অন্যান্য ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য স্থাপন করে। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কালিকটের শাসক এবং সিংহলের রাজার সঙ্গে তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইল। ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করিয়া তাহারা সুরাট, কালিকট, কোচিন, মসলিপত্তন, পাটনা, বালেশ্বর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে এবং সিংহলের কান্দী, কলম্বো, ত্রিঙ্কোমালিতে ঘাঁটি স্থাপন করে। পর্তুগীজদের মত তাহারা ধর্মান্ধ বা অত্যাচারী ছিল না। কিন্তু পরে ওলন্দাজ আধিপত্য ভারতে প্রায় নষ্ট হইয়া যায় ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা অঞ্চলে প্রধান উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতের প্রতি ওলন্দাজদের অমনোযোগই হইল ভারতে ওলন্দাজ শক্তির পতনের কারণ। পর্তুগীজ শক্তিকে দুর্বল করিয়া ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ ওলন্দাজগণই সুগম করিয়া দিয়াছিল।

ইংরেজ বণিকগণ : পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রাচ্যদেশের সহিত ব্যবসায়ের সাফল্য ইংরেজদেরও ভারতে আসিতে অনুপ্রাণিত করে।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ নাবিক ড্রেকের জলপথে বিশ্বপরিক্রমার সমাপ্তি এবং ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড কর্তৃক স্পেনিশ নৌবহরের ধ্বংস সাধন—এই দুইটি ঘটনা ইংরেজ নাবিক ও বণিকগণকে নিজেদের সামুদ্রিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল এবং পূর্বদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের অনুমতি লইয়া ইংরেজ বণিকদের দ্বারা গঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসা স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্-এর সুপারিশপত্র লইয়া ক্যাপ্টেন হকিন্স মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। সুরাটে ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংরেজ দূতরূপে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন এবং পর্তুগীজদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গুজরাট, আমেদাবাদ, সুরাট, ব্রোচ, মাদ্রাজ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ কুঠি স্থাপনে সমর্থ হন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-পর্তুগীজ চুক্তি দ্বারা ভারতে ইংরেজ ও পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পর্তুগালের রাজকন্যার বিবাহ হইলে পর্তুগাল বোম্বাই শহরটি দ্বিতীয় চার্লসকে যৌতুক হিসাবে দান করে। চার্লস উহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দেন। ক্রমে বোম্বাই ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুঠি হিসাবে পরিণত হয়। এই সময় হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে মুঘলগণ হীনবল হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে। অতিরিক্ত শুল্ক আদায়ের প্রশ্নে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধে। ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া হুগলী পরিত্যাগ করে। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক বাংলার শাসনকর্তার সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাইলেন। শান্তি স্থাপিত হইলে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার ইজারা পাইলেন। এই তিনটি গ্রামকে ঘিরিয়াই কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয় এবং বাংলা দেশের ইংরেজ কুঠিগুলিকে একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হয়। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফররুখশিয়রের ফরমান্ পাইয়া ইংরেজ বণিকরা বিনা-শুল্কে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। অবশ্য বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই ফরমান অগ্রাহ্য করেন।

ফরাসী বণিকগণ : ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফরাসীগণ যথার্থভাবে ভারতে

বাণিজ্যের প্রচেষ্টা সুরু করে। ঐ বৎসর ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর মন্ত্রী কোলবার্ট-এর চেষ্টায় ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারোর চেষ্টায় সুরাটে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পরের বৎসর মসুলিপত্তনে আরও একটি ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী কুঠি স্থাপিত হইল। ক্রমে ইহা ভারতে ফরাসী কুঠিগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। পরের বৎসর শায়েস্তা খাঁর অনুমতিতে ফরাসীরা চন্দননগরে একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইহার পরে ফরাসীরা ১৭২১, ১৭২৫ ও ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মরিসাস, মাহে ও কারিকল দখল করে। প্রথমদিকে বাণিজ্যই ছিল ফরাসীদের লক্ষ্য। কিন্তু ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। ফরাসী গভর্নর ডুপ্লে ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ফলে ইংরেজদের সহিত ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিজয়ের মধ্য দিয়া ফরাসীদের আশা বিলীন হইয়া যায়।

অপরাপর ইউরোপীয় বণিকগণ : পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও ভারতে আসিয়াছিল। দিনেমারগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী গঠন করিয়া (১৬২০ খ্রীঃ) ভারতে আসে এবং শ্রীরামপুর এবং ত্রিবাঙ্কুরে তাহাদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ত্যাগ করে। দিনেমার ছাড়াও ফ্ল্যাণ্ডার্স, সুইডেন এবং অস্ট্রিয়ার বণিকগণ নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আধিপত্যের প্রশ্নে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধ ও প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূল। এই উপকূলে মাদ্রাজে ছিল ইংরেজদের এবং পণ্ডিচেরীতে ছিল ফরাসীদের ঘাঁটি। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী দলে যোগদান করে এবং ভারতেও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় রাজাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে তাঁহারা ইংরেজ ও ফরাসীদের সাহায্য চাহিলেন এবং এই দুই শক্তি দুই পরস্পর বিরোধী পক্ষে যোগ দিল।

কর্ণাটকের পরিস্থিতি : বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী করমণ্ডল উপকূল এবং

উহার সংলগ্ন ভূখণ্ডকে কর্ণাটক বলা হইত। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উল-মুলকের অধীনে একজন নবাব কর্ণাটক শাসন করিতেন। আর্কট শহর কর্ণাটকের রাজধানী ছিল। হায়দারাবাদের নিজাম মুঘলের সুবাদার হইলেও তিনি মুঘল বাদশাহকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্যতঃ স্বাধীনভাবে শাসন-কার্য চালাইতেন। অনুরূপভাবে আর্কটের (কর্ণাটকের) নবাবও নিজামকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্যতঃ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব চালাইতেন।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা কর্ণাটক আক্রমণ করিয়া আর্কটের নবাব দোস্ত আলীকে হত্যা করে এবং নবাবের জামাতা চাঁদা সাহেবকে সাতারায় বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কর্ণাটক রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া গোলমাল সৃষ্টি হয়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হায়দারাবাদের নিজাম আনোয়ার-উদ্দীন নামে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে কর্ণাটকের নবাব নিযুক্ত করেন।

এই ব্যবস্থাতেও কর্ণাটকের গোলমাল মিটিল না। নবাব দোস্ত আলীর আত্মীয়স্বজন তখনও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। চাঁদা সাহেবও অসন্তুষ্ট হন। অসন্তুষ্টির এই সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসীরা কর্ণাটকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় নামিল।

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ : ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ নৌসেনাপতি বার্ণেটের নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ নৌবহর পণ্ডিচেরীকে বিপন্ন করিয়া তুলিলে পণ্ডিচেরীর শাসক ডুপ্লে মরিশাস্ হইতে লা **বুরদনের** নেতৃত্বে এক ফরাসী নৌবহর আনয়ন করেন। ফরাসী নৌবাহিনী মাদ্রাজ দখল করিয়া লইল। তখন আনোয়ার-উদ্দীন ছিলেন কর্ণাটকের নবাব। ডুপ্লে তাঁহাকে আশা দিয়াছিলেন যে, ফরাসীরা তাহারই হাতে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ না দেখিয়া তিনি এক বিরাট বাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে মাত্র পাঁচশত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া **সানটোমের** যুদ্ধে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। অবলীলাক্রমে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডুপ্লে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় বিভোর হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে ডুপ্লে ও লা বুরদনের মধ্যে মাদ্রাজের ভবিষ্যৎ লইয়া মতবিরোধ উপস্থিত হইল। ইংরেজরা এই সুযোগে পণ্ডিচেরী অবরোধের জন্য এক ব্যর্থ চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইল। **আয়-লা-স্যাপেলের** সন্ধির শর্ত অনুসারে ফরাসীরা ইংরেজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিল।

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল : কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের ফল ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

(ক) কর্ণাটকের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তি (ফরাসী

ও ইংরেজ) ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ করে। তাহারা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারিল যে, ভারতীয় শাসক শক্তি দুর্বল এবং পতনোন্মুখ।

(খ) ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে এবং ইংরেজ পক্ষের ক্লাইভের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে ভারতীয় সামরিক শক্তির দুর্বলতা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, ইউরোপীয় সৈন্যগণ অপেক্ষা ভারতীয় সৈন্যগণ যোদ্ধা হিসাবে নিকৃষ্ট। ইহাতে ইংরেজ ও ফরাসীদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

(গ) তাঁহারা আরও বুঝিলেন, দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইলে শক্তিশালী নৌ-বহর থাকা প্রয়োজন।

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ : প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু এই যুদ্ধ দেশীয় শক্তিগুলির সামরিক দুর্বলতা এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির সামরিক সংগঠনের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। সেই সময় দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে নিজাম উল্-মুল্ক স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আসফ জার মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিবাদ শুরু হইল। ইতিমধ্যে কর্ণাটকেও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। নিজাম-উল্-মুল্ক আনোয়ার-উদ্দীনকে কর্ণাটকের নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আনোয়ার উদ্দীন নবাবকে হত্যা করিয়া নিজেই নবাব হইয়া বসিলেন। কিন্তু কর্ণাটকের পূর্বতন এক নবাবের জামাতা চাঁদা সাহেব নবাবী দাবি করিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া এই বিরোধকে ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করিল। মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ডুপ্লে আর ইংরেজরা নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দীনকে সমর্থন করিল। ফরাসীদের সহায়তায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব মিলিতভাবে আনোয়ার-উদ্দীনকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। আনোয়ার-উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় লইলেন। ইংরেজরা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহাকেই কর্ণাটকের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল।

এদিকে ইংরেজদের মিত্র নাসির জঙ্গ আততায়ীর হাতে নিহত হইলে মুজফফর জঙ্গ হায়দারাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭৫০ খ্রীঃ)। ফলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। ডুপ্লে এক বিরাট

অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। মসুলিপত্তন বন্দর ফরাসীদের অধিকারে আসিল। অল্পকাল পরে মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিহত হইলেন। ফরাসী সেনাপতি বুসী তখন নিজামের পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে সিংহাসনে বসাইলেন। এইভাবে হায়দারাবাদে ফরাসীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল।

১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সাহায্য লইয়া চাঁদা সাহেব ত্রিচিনাপল্লীতে মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইংরেজগণ বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। রবার্ট ক্লাইভ নামক জনৈক ইংরেজ সৈনিকের কৌশলে ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় করিল। আর্কট উদ্ধারের জন্য চাঁদা সাহেব ত্রিচিনাপল্লী হইতে সৈন্য প্রেরণ করিলে সেখানকার অবরোধ দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে ইংরেজরা ফরাসীদের আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল ও ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিল। চাঁদা সাহেব বন্দী ও নিহত হইলেন। ইংরেজদের মিত্র মহম্মদ আলীই কর্ণাটকের নবাব হইলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের পরিবর্তে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। ডুপ্লের ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ফরাসী সরকারের নির্দেশে ডুপ্লে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল (১৭৫৫ খ্রীঃ)।

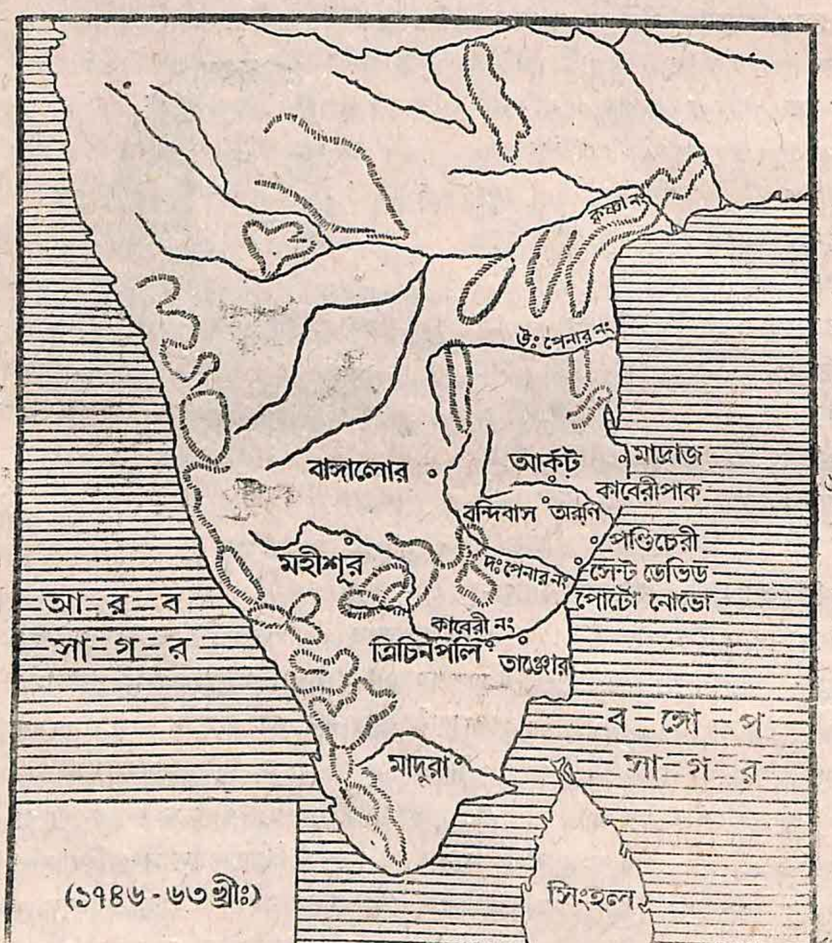


ডুপ্লে

ডুপ্লের ব্যর্থতার কারণঃ যোসেফ ডুপ্লে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের গভর্নর হিসাবে ভারতে পদার্পণ করেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরীর গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি যে অসমসাহসী যোদ্ধা, রণকুশল সেনাপতি ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। ভারতের রাজশক্তির দুর্বলতা ও গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া বিদেশী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তাঁহার মনে বর্তমান ছিল। তাঁহার চরিত্রে এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য, অপরের সম্পর্কে অবজ্ঞা, অধৈর্য প্রভৃতি দোষের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দরুন তিনি ফরাসী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা সমর্থনের

অপেক্ষা না রাখিয়াই কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে এই দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিলেন না

ডুপ্লের সঙ্গে নৌ সেনাপতি লা-বুর্দনের একাধিক বার মতভেদ ঘটে। সুদক্ষ সেনাপতি বুসীকে কর্ণাটকে না রাখিয়া হায়দারাবাদে পাঠান তাঁহার পক্ষে মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। এইরূপ নানা বিধ কারণে দাক্ষিণাত্যের



কর্ণাটকে তিনি ব্যর্থ হন এবং ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সরকারী হুকুমে ফরাসীদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। ব্যর্থতা সত্বেও এই কথা বলা যায় যে, স্বদেশের মর্যাদা ও গৌরব সম্বন্ধে পরম আগ্রহশীল এই ব্যক্তিকে ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একজন মহারথী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ : ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে "সপ্তবর্ষ যুদ্ধ" সুরু হইলে এদেশে দাক্ষিণাত্যেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফরাসী সরকার কাউণ্ট লালীকে প্রধান সেনাপতি ও শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি এদেশে আসিয়া প্রথমে ইংরেজদের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ দখল করিয়া লইলেন। মাদ্রাজ জয়ের জন্য তিনি বুসীকে হায়দারাবাদ হইতে সরাইয়া আনিলেন। কিন্তু বুসী কর্ণাটকে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজাম দরবারে ফরাসী প্রতিপত্তি অবলুপ্ত হইল। লালী মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরেজ নৌবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ঐ বৎসরই স্যার আর্থার কূট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীও ইংরেজরা অধিকার করিল এবং পরে জিঞ্জি ও মাহের পতন ঘটিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইলে ভারতেও দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ভারতে ফরাসীগণ তাহাদের স্থানসমূহ ফিরিয়া পাইল। কিন্তু এই স্থানগুলি কেবল বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেই ব্যবহৃত হইবে এই প্রতিশ্রুতি তাহাদের দিতে হইল। ভারতের রাজনীতিতে ফরাসী প্রভাব চিরতরে লুপ্ত হইল।

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ : ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ বহুবিধ। নিম্নে সংক্ষেপে কারণগুলি উল্লেখ করা হইল :

(ক) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ, নৌ-শক্তিতে ফরাসীরা ইংরেজদের অপেক্ষা অনেক দুর্বল ছিল।

(খ) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাহায্যে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হইয়াছিল। সেইজন্য সর্ববিষয়ে এই কোম্পানীকে সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসাদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া এই জাতীয় অসুবিধা ছিল না।

(গ) ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্থের অভাবে ক্রমাগত বিপন্ন হইতে হয় ; কিন্তু ইংরেজদের অর্থাভাব ছিল না।

(ঘ) ফরাসী সরকার ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী তো ছিলেনই না বরং উদাসীন ছিলেন বলা যায়। ভারতে ফরাসীদিগকে ফরাসী সরকার সময় মত সাহায্য করেন নাই, এমন কি প্রয়োজনীয় অর্থও দেন নাই ; উপরন্তু ভারতে ফরাসী গভর্নরদের কার্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন।

(ঙ) ভারতে ফরাসীদের উপযুক্ত কোন ঘাঁটি ছিল না ; অন্যদিকে

বাংলা জয়ের পর কলিকাতায় ইংরেজদের স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে ইংরেজ ইচ্ছামত অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত।

একজন ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন, "বাংলা যাহাদের হাতে, আর সমুদ্রে যাহারা বিপুল শক্তির অধিকারী, পণ্ডিচেরীর ঘাঁটি হইতে তাহাদের হটাইতে হইলে আলেকজান্দার বা নেপোলিয়নের প্রতিভাও পর্যাপ্ত নহে।"

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) :

1. সঠিক উত্তর টিক্ (✓) দিয়া বুঝাইয়া দাও :

(i) ভারতে পর্তুগীজ শক্তির স্থাপয়িতা ছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা/আলবুকার্ক/সেন্ট জেভিয়ার।

(ii) ইংরেজরা জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ফরমান লাভ করেন ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে / ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে / ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে / ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে।

(iii) কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন টমাস রো / ফ্রান্সিস ডে / জব চার্ণক / লর্ড ক্লাইভ।

(iv) কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে / ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে / ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে / ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

2. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(i) —খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয়।

(ii) কিন্তু কর্ণাটকের পূর্বতন নবাবের জামাতা—নবাবী দাবি করিলেন।

(iii) ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সাহায্য লইয়া চাঁদা সাহেব—মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

(iv) রবার্ট ক্লাইভ নামক জনৈক ইংরেজ সৈনিকের কৌশলে ইংরেজ পক্ষ—জয় করিলেন।

(v) ঐ বৎসরই — বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) :

1. কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

2. কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ বর্ণনা কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay Type Questions) :

1. ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রচেষ্টার বিবরণ দাও।

2. ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরেজ বণিকগণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

3. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর।

4. ডুপ্লের কার্যাবলী বর্ণনা কর। তাহার ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
ইংরেজ শক্তির বিকাশ
ক্লাইভ হইতে ডালহৌসী

বাংলায় প্রতিরোধের প্রকৃতি : ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুদয়ের গোড়াপত্তনের প্রথম ধাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের মাধ্যমে। ইহার দ্বিতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বাংলাদেশে।

মুঘল সম্রাট আকবরের আমল হইতে ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশ মুঘল সম্রাটদেরই অধীনে ছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতে বাংলার নবাবগণ একরকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব সুরু করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিবার অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের শুল্ক দিতে বাধ্য করেন। যদিও ইংরেজরা ঐ সুযোগ সম্রাট ফাররুকশিয়ারের নিকট হইতে আদায় করিয়াছিল। পরবর্তী নবাব সুজা-উদ্দীন ইংরেজদের ব্যবসায় বাণিজ্যে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করিতেন। সুজার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন। সেই সময় নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ সরফরাজ খাঁকে ঘেরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিয়া লইলেন।

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) : আলিবর্দী খাঁ দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌কে প্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাংলার নবাব হিসাবে নিজের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইলেন। আলিবর্দী খাঁ ছিলেন উদারচেতা ও দক্ষ শাসক। আলিবর্দীর আমলে বাংলাদেশে বর্গী অর্থাৎ মারাঠাদের আক্রমণ প্রায় বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। বর্গীদের হাত হইতে দেশকে রক্ষার জন্য আলিবর্দী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৎসরে বার লক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যার একাংশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার মারাঠাদিগকে দিয়া তাহাদের আক্রমণ হইতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই বাংলাদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলিবর্দীর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা থাকিলেও তাহাদের প্রতি তিনি কোন বিদ্বেষভাব দেখান নাই। ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকিয়া তিনি তাহাদের বাণিজ্যের সুযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দুর্গ নির্মাণ বা কোন রকম সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিতে চাহেন নাই।

ইংরেজদের শক্তি ও অর্থবল যে বাড়িতেছে তাহা আলিবর্দী বুঝিতে

পারিয়াছিলেন এবং নৌবলে বলীয়ান ইংরেজদের বাংলাদেশ হইতে বিতাড়ন করাও যে শক্ত কাজ তাহাও তাঁহার বোধগম্য ছিল। একবার তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, স্থলে আগুন লাগিলে তাহা নিভানো কঠিন (এখানে বর্গী আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে) কিন্তু জলে আগুন লাগিলে কে তাহা নিভাইতে পারিবে? এইভাবে ইংরেজদের নৌশক্তি সম্বন্ধেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইংরেজ কোম্পানী অন্যায় বাড়াবাড়ি করিলে তাহাদের শাস্তি দিতেও তিনি কসুর করেন নাই। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্যায় আচরণের জন্য শেষ পর্যন্ত দেড় লক্ষ টাকা দিয়া ইংরেজদের নবাবকে তুষ্ট করিতে হইয়াছিল। আলিবর্দী খাঁ ইংরেজদের প্রতি সতর্ক অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার তিন কন্যার ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার শাসকদের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। জীবিত অবস্থায় তিনি প্রিয় দৌহিত্র (কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র) সিরাজ-উদ্-দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। সিরাজ-উদ্-দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন।



আলিবর্দী খাঁ

সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ): আলিবর্দীর প্রথমা কন্যা মেহেরুন্নিসা বা ঘসেটি বেগম ছিলেন ঢাকার নবাব শহমৎ জঙ্গ বা নাওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁর স্ত্রী। ঘসেটি বেগমের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং তৃতীয়া কন্যার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলার মধ্যে সিরাজকেই আলিবর্দী বেশী স্নেহ করিতেন। সিরাজকে উত্তরাধিকারী করায় ঘসেটি বেগম এবং সৌকৎ জঙ্গ উভয়েই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উভয়েই সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। তাঁহাদের সাহায্য করিতে আসিলেন ঘসেটির দেওয়ান রাজবল্লভ। জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদের মতো ধনী ও স্বার্থপর বণিকেরা তরুণ নবাবের বিরুদ্ধে একত্রিত হইতে লাগিলেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলা মসনদে বসিবার সময় হইতেই ইংরেজ বণিকগণ তাঁহার বিরোধিতা সুরু করে। নূতন নবাব সিংহাসনে বসিলে ইংরেজরা নজরানা পাঠাইবার চিরাচরিত প্রথা অমান্য করে। ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের

পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর অর্থ ও ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় গিয়া ইংরেজদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। সিরাজের নির্দেশ সত্ত্বেও ইংরেজগণ কৃষ্ণদাসকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিল না। এইসময় ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জন্য ভারতেও যুদ্ধ বাধার আশঙ্কায় ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ তাহাদের নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন, দুর্গ নির্মাণ, অস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। সিরাজ তাহাদের এইসব যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। ফরাসী বণিকগণ সিরাজের আদেশ মানিল। কিন্তু ইংরেজগণ এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিল।



সিরাজ-উদ্-দৌলা

ঘসেটি বেগম ও রাজবল্লভের সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগ ঘটিতেছে—সিরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সুকৌশলে তিনি ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া আসিলেন। ইহাতে ইংরেজরা ভয় পাইয়া গিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পূর্বের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্গ নির্মাণ চালাইয়া যাইতে লাগিল।

কলিকাতা অভিযান ঃ এদিকে সৌকৎ জঙ্গকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া সিরাজ ইংরেজদের নিকট হইতে যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করিবার আদেশের উত্তর পাইলেন। তাহাদের উত্তর অত্যন্ত অসন্তোষজনক বিবেচনা করিয়া সিরাজ রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করিয়া লইলেন (জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ)। পরের দিনই সসৈন্যে কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কলিকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সাঙ্গোপাঙ্গো সহ পলাইয়া গিয়া ফলতায় আশ্রয় লইলেন। সিরাজ কলিকাতা অধিকার করিলেন। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দখল করিবার সময় যে কয়জন ইংরেজ সৈন্য আহত হইয়াছিল তাহাদের ভার অধস্তন কর্মচারীদের উপর দেওয়া হইল। রাত্রিতে এই আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হলওয়েল একটি অলীক কাহিনী রচনা করিলেন। এই কাহিনী অনুসারে মোট ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে সেই রাত্রিতে রাখিবার ফলে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল। পরবর্তিকালে ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সম্পূর্ণ অলীক সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিপূর্ণ কাহিনী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজ গিয়া পৌঁছাইল এবং

সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন একদল সৈন্য ও নৌবহর লইয়া বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাবের প্রতিনিধি মানিকচাঁদের বিশ্বাস ঘাতকতায় ইংরেজরা সহজেই কলিকাতা দখল করিল এবং হুগলী লুণ্ঠন করিল। সিরাজ পুনরায় সৈন্য লইয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ক্লাইভও বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে আলিনগরের সন্ধি নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার এবং কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ, টাকশাল স্থাপন প্রভৃতি বহু সুবিধা লাভ করিল। স্থির হইল নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকিবেন।

পলাশীর যুদ্ধ ঃ ইহার পর ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রে ক্লাইভ চন্দননগরে ফরাসী ঘাঁটি দখল করিয়া লইলেন। ইহাতে ফরাসীদের নিকট হইতে সিরাজের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। এদিকে সিরাজের পদস্থ কর্মচারিগণ যথা—মীরজাফর, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি, তাঁহাকে মসনদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। মীরজাফর ছিলেন আলিবর্দী খাঁর ভগ্নীপতি। মসনদের লোভ তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের নায়ক করিয়া তুলিল। রবার্ট ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন এবং সামান্য অজুহাতে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল। অধিকাংশ নবাবী সৈন্য মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নির্দেশে নিশ্চেষ্ট রহিল। মীরমদন ও মোহনলালের বীরত্বে ইংরেজদের পরাজয় যখন অবধারিত সেই সময় মীরজাফরের পরামর্শে সিরাজ যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন। সেই সুযোগে ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ নবাবী সৈন্যদের পরাজিত করিলেন। এইভাবে ক্লাইভ প্রকৃত-পক্ষে জয়লাভ না করিয়াও ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়ী হইলেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিয়া নূতন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই আশা ব্যর্থ হইলে ভাগলপুরে ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মসিয়ে ল'র সাহায্য লইবার জন্য গোপনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। সেখানে মীরজাফরের আদেশে তাঁহার পুত্র মিরন কর্তৃক নিহত হইলেন। এইভাবে জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া ইংরেজদের সাহায্যে মীরজাফর বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ঃ পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে এক রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত

হইল। পলাশীর যুদ্ধ ছিল বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রথম সোপান। এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্মূল হওয়ায় এবং বাংলার সম্পদ হাতে পাওয়ায় দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ইংরেজদের জয়লাভ করা সহজ হইয়াছিল। বাংলাদেশেও তাঁহাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশে তাহারা একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইলেন। দুর্বল মীরজাফর ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হইলেন। ইংরেজদের সাহায্যের বিনিময়ে তাহাদের অভাবনীয় পারিতোষিক দিতে গিয়া মীরজাফর কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং সামরিক দিক হইতেও তাহাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে ইংরেজরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইল।

সিরাজের চরিত্র ও কৃতিত্ব : কেহ কেহ সিরাজকে উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন অকর্মণ্য যুবক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার চরিত্রে দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহার নিঃস্বার্থ প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। সেই যুগে ধনবান যুবকদের চরিত্রে যে-সকল দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইত সেগুলি স্বভাবতই সিরাজের চরিত্রেও বর্তমান ছিল। তাহাছাড়া মাতামহের স্নেহান্ধতায় তাঁহার চারিত্রিক ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। অল্প বয়সে নবাব হইবার ফলে তাঁহার চরিত্রে ঔদ্ধত্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতাও দেখা দিয়াছিল। শাসন ব্যাপারে দূরদর্শিতার অভাব হেতু তিনি কতকগুলি ভুলভ্রান্তিও করিয়াছিলেন। মীরজাফরের ছলনায় ভুলিয়া এবং তাহার কুপরামর্শে মোহনলালকে যুদ্ধবন্ধের নির্দেশ দিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি এমন কতকগুলি কাজ করিয়াছিলেন যাহা নবাব হিসাবে তাঁহার দক্ষতা বা দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে। ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনিয়া এবং আকস্মিকভাবে কলিকাতা দখল করিয়া তিনি তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। দেশরক্ষার জন্য তাঁহার চেষ্টা এবং বাংলার নবাবের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে প্রশংসার পাত্র করিয়াছে।

মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ খ্রীঃ) : পলাশীর যুদ্ধে দেশদ্রোহিতা করিয়া মীর-জাফর ইংরেজদের জয়লাভে সাহায্য করিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ বাংলার মসনদ লাভ করিলেন। ইংরেজরা ২৫ লক্ষ টাকা এবং বৎসরে ৩০ হাজার পাউণ্ড আয়ের জমিদারী পাইল। ইহা ছাড়া ইংরেজ কর্মচারি-গণ মুর্শিদাবাদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিল। ইংরেজদের দাবি মিটাইতে গিয়া রাজকোষের অর্থ ফুরাইয়া গেল। ইহার

পর পূর্ণিয়ার সৌকৎ জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য লইয়া মীরজাফর ঋণ আরও বাড়াইয়া ফেলিলেন। এই আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতার ফলে মীরজাফর মস্‌নদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা লইয়া ইংরেজদের সহিত মীরজাফরের বিবাদ উপস্থিত হইল। ইংরেজদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মীরজাফর চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বা ডাচ বণিকদের সহিত গোপনে যোগাযোগ করিলেন। তাহারা বাটাভিয়া হইতে মীরজাফরের সাহায্যের জন্য কয়েকখানি জাহাজও আনাইল। এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইভ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেরা নামক স্থানে ওলন্দাজ নৌবহরকে পরাজিত করিলেন। এই পরাজয়ের পর ওলন্দাজরা বাংলাদেশ ত্যাগ করিল। পর বৎসর ক্লাইভ বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন।


মীরজাফর

মীরজাফরকে তাঁহার কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ মসনদচ্যুত করা হইল এবং তাঁহার জামাতা মীরকাশিম নবাব হইলেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মীরকাশিমও প্রচুর পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁহাকেও অপসৃত হইতে হইয়াছিল।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ আবার ভারতে আসিলে মীরজাফর কোম্পানীকে প্রচুর টাকা ও নানাবিধ বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়া দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলার নবাব হ'ন। এই সময়ে তিনি শাসনযন্ত্রকে ইংরেজদের আধিপত্য হইতে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। অবশেষে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। ইহার পর তাঁহার পুত্র নজম্‌-উদ্‌-দৌলাকে নবাবপদে স্থাপন করা হয়। এই সময় হইতে বাংলার নবাব ইংরেজদের ভাতাভোগী নামে মাত্র নবাবে পরিণত হইলেন।

মীরকাশিম : (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ): মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী দিলেন। ইংরেজ শাসনকর্তা ভ্যান্‌সিটার্ট এবং তাঁহার পরিষদ দুইলক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু শীঘ্রই মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধ বাধিল।

মীরকাশিম ছিলেন দূরদর্শী স্বাধীনচেতা মানুষ। ইংরেজদের সর্বময় প্রাধান্য তাঁহার কাছে অসহ্য মনে হইল। মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তিনি সেনাবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হইলেন। তখন দেশে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানী বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। ইংরেজ কোম্পানী 'দস্তক' নামে ছাড়পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিলে সেই দস্তক দেখাইয়া ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিনা শুল্কে লইয়া যাইতে পারিত। ইংরেজ কর্মচারিগণ এই দস্তকের অপব্যবহার শুরু করিল। তাহারাও কোনরূপ শুল্ক না দিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। অথচ দেশী বণিকদের ঐ কর দিতে হইত এবং ইহার জন্য তাহাদের মালের দাম স্বভাবতই বেশী হইত।



মীরকাশিম

ইংরেজগণ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম দামে মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে লাগিল। মীরকাশিম এই ব্যাপারে ইংরেজ গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি এক আদেশ জারী করিয়া দেশী ও বিদেশী বণিকদের শুল্ক বা কর হইতে রেহাই দিলেন। ইহাতে তাঁহার রাজস্বের প্রচুর ক্ষতি হইল। কিন্তু নিজ প্রজাবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য সেই ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইলেন।

ইহাতে পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনা শহরটি দখল করিয়া লইলেন। মীরকাশিম পাটনা পুনর্দখল করিয়া সেখানকার ইংরেজ কুঠি ধ্বংস করিলেন। অবশেষে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাশিম পাটনায় পলায়ন করিলেন এবং সেখানে এলিস সহ ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিলেন। তারপর তিনি অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন।

বক্সারের যুদ্ধ ঃ অতঃপর মীরকাশিম ইংরেজদের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি অযোধ্যার নবাব এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এই ত্রিশক্তি জোটের সেনাবাহিনী পাটনার দিকে অগ্রসর হইল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে বক্সারের রণক্ষেত্রে এই সেনাবাহিনীকে মেজর মুনরো পরাজিত করিলেন।

মীরকাশিম নেপালের দিকে পলাইয়া গেলেন। ভারতের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজরা এদেশে তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, আর বক্সারের যুদ্ধে উহার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিল। এই যুদ্ধে ইংরেজরা বঙ্গ-বিহার বিজয় সম্পূর্ণ করিল।

মীরকাশিমের চরিত্র: মীরকাশিম ছিলেন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা, প্রজাবৎসল নবাব। ইংরেজদের সাহায্যে তিনি বাংলার মসনদে বসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইংরেজদের তাঁবেদারী করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ। বাংলাদেশকে রক্ষা করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছেন।

রবার্ট ক্লাইভ

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরানীর চাকুরি গ্রহণ করিয়া রবার্ট ক্লাইভ ভারতে আসেন। তিনি মাদ্রাজে ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্রে কাজ শুরু করেন। কিছুকাল কেরানীর কাজ করিবার পর তিনি কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁহার তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ জয়ী হয়। তাঁহার সমরকুশলতার ফলেই দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ডুপ্লের ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।



রবার্ট ক্লাইভ

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পুনর্দখলের সময় ক্লাইভ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নরপদে আসীন হন। আলিনগরের চুক্তির মাধ্যমে বিনা শুল্কে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অধিকার, দুর্গ নির্মাণের অধিকার প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা তিনি সিরাজের নিকট হইতে আদায় করেন।

ইহার পর ক্লাইভ সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত যোগ দেন। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির নিষ্ক্রিয়তার ফলে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ জয়ী হইলেন। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ক্লাইভও প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। মীরজাফর মসনদে আরোহণ করিলেন। ক্লাইভ ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করিলেন। বাংলার

নবাবীর পশ্চাতে প্রকৃত শক্তি হইয়া উঠিল ইংরেজ কোম্পানী। বাটাভিয়া হইতে আগত ওলন্দাজ নৌবহরকে বিদেরার যুদ্ধে ক্লাইভ পরাজিত করেন (১৭৫৯ খ্রীঃ) এবং পর বৎসর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান (১৭৬০ খ্রীঃ)।

ক্লাইভের দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন : বক্সারের যুদ্ধের কয়েকমাস পরে ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতে ইংরেজ শাসনকর্তা হিসাবে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ইংরেজ কর্মচারীরা যেন তেন প্রকারে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে তাঁহাকে বাংলাদেশে পাঠানো হইল। ইতিপূর্বে তাঁহাকে 'লর্ড' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

বাংলাদেশে পৌঁছিয়াই ক্লাইভ কোম্পানীর শাসনে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিলেন। শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় করা ও পারিতোষিক নেওয়া বন্ধ করিলেন। তাহাদের মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া দুর্নীতিমুক্ত করিবার উদ্যোগ লইলেন এবং সেনাবাহিনীর সংস্কার করিয়া তাহা শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার প্রতিশ্রুতিতে মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেন। ইহার ফলে রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী বিচারের ভার ইংরেজদের উপর ন্যস্ত হইল। এই দেওয়ানী লাভের ফলে তাহারা নবাবের সমপর্যায়ভুক্ত হইল এবং তাহাদের অধিকার আইনত স্বীকৃত হইল। দেওয়ানী লাভের পর ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের এবং দেওয়ানী বিচারের দায়িত্ব নবাবের উপরই রাখিয়া দিলেন। বাংলার রাজস্ব সম্পর্কে ইংরেজদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে দেওয়ানীর যাবতীয় কাজের দায়িত্ব রহিল নবারের উপর, কিন্তু রাজস্বের অধিকার রহিল ইংরেজদের হাতে। ইহার ফলে নবাব পাইলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। আর ইংরেজদের হাতে রহিল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এই ব্যবস্থা **'দ্বৈত শাসন'** (Dual Government) নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই শাসনব্যবস্থা প্রজাবর্গের প্রতি দায়িত্ব পালনের অনুকূল ছিল না। ইংরেজগণ অধিক পরিমাণ অর্থ আদায়ের দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিল। ফলে শাসনের নামে শোষণ চলিতে লাগিল। বাংলার জনজীবনে স্বভাবতঃই এক দুর্দিন দেখা দিল। এই শাসনেরই কুফল হিসাবে ১১৭৬ সনে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলাদেশে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাই ইতিহাসে **"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"** নামে পরিচিত হইয়াছে।

এই সময়েই ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ৬০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লাভ করেন।

এইভাবে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, সাহসিকতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে ক্লাইভ ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। লর্ড ক্লাইভ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীচতা, শঠতা, জালিয়াতি—যে কোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না। নিজ ক্ষমতাবলে সামান্য কেরানী হইতে তিনি গভর্নরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের বিচারে এবং ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ক্লাইভের ভূমিকা নিন্দনীয় হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে তাঁহার কার্যকলাপ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) : ক্লাইভের পরবর্তিকালে ভেরলস্ট ও কার্টিয়ার পর পর গভর্নর হন। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় বা ইংরেজ শক্তির বিস্তারে তাঁহাদের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চরম বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস্কে বাংলার গভর্নর করিয়া পাঠানো হইল। সেই সময়ে বাংলায় কোম্পানীর শাসনে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা শক্তি, মহীশূর রাজ্য প্রভৃতি দেশীয় শক্তির সহিত সংঘর্ষ শুরু হইয়া গিয়াছিল। হেস্টিংস এদেশে আসিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে—এক সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া পড়িয়াছে। এই সাম্রাজ্যকে টিকাইয়া রাখিবার জন্যই ইহার বিস্তার প্রয়োজন। হেস্টিংস্-এর শাসনকালকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন বাংলার গভর্নর। তাহার পর 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামক আইন অনুযায়ী তিনি 'গভর্নর জেনারেল' হইলেন। ঐ আইনে স্থির হয় যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর গভর্নরদ্বয়কে অতঃপর গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে।



ওয়ারেন হেস্টিংস্

তখন মারাঠা ও মহীশূর ভিন্ন অপর কোন শক্তিই ব্রিটিশের সমকক্ষ ছিল না। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম তখন মারাঠাদের প্রভাবাধীন। হেস্টিংস দেখিলেন যে, সম্রাট্কে ইংরেজদের দেয় অর্থ মারাঠাদেরই শক্তিবৃদ্ধি

করিতেছে। তিনি শাহ আলমকে দেয় বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটির কর্তৃত্ব তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে দেওয়া হইল। নবাব মূল্যস্বরূপ কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিলেন। এইভাবে অযোধ্যার নবাবের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি অযোধ্যাকে একটি শক্ত প্রাচীর হিসাবে দাঁড় করাইতে সচেষ্ট হইলেন। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এই সময় ইংরেজদের ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া সৈন্য সাহায্য লইলেন এবং রোহিলখণ্ড নামক অঞ্চলটি দখল করিয়া লইলেন।

মারাঠাদের আত্মকলহ, শক্তিশালী মহীশূর রাজ্যের সহিত তাহাদের শত্রুতা এবং সেই দ্বন্দ্বে পরস্পরের ইংরেজ সাহায্য গ্রহণের মনোবৃত্তি ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রসারের পথকে সুগম করিয়া তুলিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ : পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর সুযোগ্য শাসক পেশোয়া **মাধব রাওয়ের** নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। মাধব রাওয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা **নারায়ণ রাও** এবং পিতৃব্য **রঘুনাথ রাও** বা রাঘোবার মধ্যে পেশোয়া পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইল। রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়া পেশোয়া হইলেও নানা **ফড়নবিশ** প্রমুখ মারাঠা সঙ্ঘের অধিকাংশ নেতা তাহা মানিয়া **লইতে অসম্মত হন।** কিছুদিনের মধ্যে নারায়ণ রাও-এর পত্নীর একটি পুত্র **সন্তান** জন্মলাভ করিলে নানা ফড়নবিশের নেতৃত্বে মারাঠাগণ এই নবজাতককে (দ্বিতীয় মাধব রাওকে) পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃতি দিলেন। রাঘোবা পুনা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বোম্বাই-এ ইংরেজদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সলসেট ও বেসিন নামক স্থান দুইটি এবং ভারুচ বা ভৃগুকচ্ছের ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ ইংরেজদের দিবার বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইলেন। ইহা সুরাটের চুক্তি (১৭৭৫ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ইহার পর ইংরেজগণ রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁহার কাউন্সিল সুরাটের চুক্তি অনুমোদন না করায় কয়েকমাসের মধ্যে পুরন্দর নামক স্থানে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে **পুরন্দরের সন্ধি** (১৭৭৬ খ্রীঃ) স্থাপিত হইল। বোম্বাই-এর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সুরাটের চুক্তি অনুমোদন করিয়া পাঠাইলে বোম্বাই-এর ইংরেজগণ রাঘোবার পক্ষ অবলম্বন করিয়া পুনার মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিল। কিন্তু এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ওয়ারগাঁও নামক স্থানে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিয়া রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধি না মানিয়া মারাঠাদের বিরুদ্ধে

এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত সুরাটের চুক্তি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইংরেজগণ নারায়ণ রাওয়ের পুত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রাঘোবাকে বাৎসরিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইল। ইংরেজরা সলসেট নিজেদের দখলে রাখিয়া দিল। এই চুক্তির ফলে ইংরেজদের বিশেষ কিছু লাভ না হইলেও তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের শেষে সন্ধির সময় ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, মহীশূর রাজ্য আক্রান্ত হইলে মহীশূর ইংরেজের সাহায্য পাইবে। কিন্তু ১৭৭১ খ্রীঃ মহীশূর রাজ্য মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইংরেজরা নীরবতা অবলম্বন করে। ইহাতে মহীশূর অধিপতি হায়দার আলী অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইংরেজরা মহীশূরের অন্তর্গত ও ফরাসী অধিকৃত মাহে বন্দর দখল করিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০ খ্রীঃ) আরম্ভ হইল। ম্যাঙ্গালোরের যুদ্ধ দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ইহার শর্তানুসারে ইংরেজ ও মহীশূর রাজ্য পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল। এই যুদ্ধের অর্থ যোগাড় করিবার জন্য হেস্টিংস অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্দোষ রোহিলাদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে অর্থ লইয়া সৈন্য ভাড়া দিয়াছিলেন। অযোধ্যার বেগমদের উপর নির্যাতন করিয়া অর্থ আদায় করিয়াছিলেন। বারাণসীর রাজা চৈত্‌ সিংহের নিকট হইতে তাঁহার দেয় বাৎসরিক কর অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ টাকা বেশি দিবার আদেশ করিলেন এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্য চাহিলেন। এই অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইলে হেস্টিংস তাঁহাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। এই অর্থ আদায়ের অজুহাতে হেস্টিংস স্বয়ং অগ্রসর হইয়া চৈত্‌ সিংহকে বন্দী করিলেন। ইহাতে রাজার প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে হেস্টিংস্ দৃঢ়হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং চৈত্‌ সিংহকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার জনৈক আত্মীয় মহীপনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের এই সব অত্যাচার ও অবিচারের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হইতে থাকিল। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেলের পদ হইতে পদত্যাগ করিয়া তিনি দেশে চলিয়া গেলেন (১৭৮৫ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহাতেও তিনি অব্যাহতি পান নাই। ৩ বৎসর পরে 'হাউস অব লর্ডস্'-এ তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইল। দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া এই বিচার বা "ইম্পীচমেণ্ট" চলিয়াছিল। বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক হেস্টিংস্‌কে 'মানবজাতির শত্রু" বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে

সমস্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও অবমাননা হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের পদত্যাগের পর স্যার জন ম্যাকফারসন এক বৎসর অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসাবে কাজ করেন। ইহার পর গভর্নর জেনারেল হিসাবে আসিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। কোম্পানীর শাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করিয়া উহাকে সুবিন্যস্ত করিবার বিশেষ দায়িত্ব কর্নওয়ালিসের উপর দেওয়া হইয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত শাসন পরিচালনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিটের ভারত শাসন আইন (Pitt's India Act, 1784) অনুসারে ইংলণ্ডের মর্যাদার স্বার্থে কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা ভিন্ন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম কয়েক বৎসর লর্ড কর্নওয়ালিস যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলেও তিনি তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২ খ্রীঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। মাদুরা, সালেম জেলার কতকাংশ, কুর্গ, মালাবার প্রভৃতি স্থান কোম্পানীর অধিকারে আসিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে মোটামুটি শান্তির নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকাল অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন, প্রশাসনিক সংস্কার প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।



লর্ড কর্নওয়ালিস

মহীশূর রাজ্য কর্তৃক ইংরেজ শক্তির প্রতিরোধ

কর্ণাটক এবং বাংলা যখন রাজনৈতিক বিপ্লবে আলোড়িত হইতেছিল, দক্ষিণ ভারতে মহীশূরে তখন হায়দর আলী নামে এক সাহসী যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির উত্থান হইল। ভারতের ইতিহাসে যে কয়জন ভারতীয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, হায়দর আলী তাঁহাদের অন্যতম। হায়দর আলী এবং তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান দেশরক্ষা

ও ইংরেজ বিতাড়নের জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে উভয়েই স্বাধীনচেতা নৃপতি হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

হায়দর আলী (১৭৬১-৮২ খ্রীঃ) : মহীশূরের হিন্দুরাজার অধীনে একজন সামান্য সৈনিক হিসাবে হায়দর আলী জীবন শুরু করেন। তিনি প্রথমে



হায়দর আলী

মহীশূর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নাঞ্জরাজের অধীনে সৈনিকের কাজে যোগদান করেন। হায়দরের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হইয়া নাঞ্জরাজ তাঁহাকে দিন্দিগাল-এর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া নাঞ্জরাজকেই ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তিনি মহীশূর রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া বসেন। অল্পকাল পরে রাজার মৃত্যু হইলে হায়দর আলী মহীশূরের সুলতান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : মারাঠাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগে হায়দর কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অভিযান করেন এবং রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবার আগেই পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব

রাও মহীশূর আক্রমণ করিলেন। হায়দর আলী পরাজিত হইয়া কয়েকটি জায়গা ও ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া মারাঠাদের সন্তুষ্ট করিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। এই সময় হায়দারাবাদের নিজামও হায়দরের শক্তিতে ভীত হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তি করিলেন। ইংরেজদের নিকট হইতে সাহায্যের বিনিময়ে তিনি নিজ রাজ্যের একাংশ তাহাদের ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৭৬৬ খ্রীঃ)। এইভাবে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ এই তিন শক্তি হায়দরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইল। নিজাম ও ইংরেজদের মিলিত বাহিনী হায়দরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। হায়দর আলীর চেষ্টায় নিজাম ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইংরেজগণ এককভাবেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। প্রথম দিকে হায়দর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল বেগে অগ্রসর হইয়া তিনি মাদ্রাজের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে ইংরেজরা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি দিল যে, অন্য কোন রাষ্ট্র মহীশূর আক্রমণ করিলে তাহারা হায়দর আলীকে সাহায্য করিবে। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরের সন্ধি বেশী দিন টিকিল না। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিল। ইংরেজগণ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিল না। তদুপরি ইংরেজগণ হায়দরের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মহীশূরের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে দখল করিয়া বসিল। এই ঘটনা হায়দরের মনে তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারাঠা ও নিজামের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। আশী হাজার সৈন্যসহ তিনি বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া ইংরেজদের পরাজিত করিয়া আর্কট অধিকার করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। বাংলাদেশ হইতে ওয়ারেন হেস্টিংস্ হায়দরের বিরুদ্ধে স্যার আয়ার কুটকে প্রেরণ করিলেন। হেস্টিংস কূটনীতির সাহায্যে নিজাম ও মারাঠাদের হায়দরের পক্ষ হইতে সরাইয়া লইলেন। হায়দর আলী আবার একাকী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টোনোভোর যুদ্ধে আয়ার কূটের নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। ইহার পর ইংরেজগণ নেগাপট্টম, ত্রিনকোমালি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল। অপর দিকে হায়দর আলীর পুত্র টিপু সুলতানের হাতে ইংরেজ কর্নেল ব্রেথওয়েট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন। সেই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের একটি নৌবহর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলে হায়দর আলী আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইহার সাহায্য লাভের পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু হইল (১৭৮২ খ্রীঃ)। হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন।

হায়দরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : নিজ কর্মদক্ষতা, সাহস ও কৃতিত্বের বলে হায়দর সামান্য সৈনিক হইতে মহীশূরের সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। রাজ্য সংগঠনে এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। একই সময়ে একাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতে গিয়াও তিনি আত্মবিশ্বাস হারান নাই, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, স্বাধীন মনোবৃত্তি ও দেশাত্মবোধ এবং বিদেশীদের হাত হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহার আমরণ প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

টিপু সুলতান : হায়দর আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টিপু মহীশূরের সুলতান হইলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁহার সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দক্ষতার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। তিনি ম্যাঙ্গালোর অবরোধ করেন এবং ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসকে তাঁহার সৈন্যদলসহ বন্দী করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের উদ্যোগে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু হইল এবং ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৮৪ খ্রীঃ)। ইহার শর্ত অনুযায়ী বন্দী বিনিময় হইল এবং পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে।



টিপু সুলতান

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে ম্যাঙ্গালোর চুক্তি অনুসারে টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল। তেজস্বী টিপু দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্বকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইংরেজদের পক্ষেও টিপুকে বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজদের প্রাধান্য ধ্বংস করার জন্য টিপু ইংরেজদের পরম শত্রু ফরাসীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কনস্টান্টিনোপল, মরিশস, কাবুল প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কর্নওয়ালিস নিরপেক্ষ নীতির ছদ্মবেশে টিপুর বিরুদ্ধে শক্তি সমবায় গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দারাবাদের নিজামের নিকট তিনি এই

ধরনের প্রস্তাব পাঠাইলেন। ইহা ছিল ম্যাঙ্গালোরের চুক্তির শর্তবিরোধী। টিপু ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া ইংরেজদের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এইভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনী টিপুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল এবং টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিল। টিপু বাধ্য হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিতে (১৭৯২ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করিলেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ বিপুল অর্থ ছাড়াও তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে হইল। ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম ঐ অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূ হিসাবে ইংরেজদের নিকট বসবাস করিতে লাগিল।

স্বাধীনচেতা টিপু এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা চালাইতে লাগিলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গগুলির সংস্কার এবং সৈন্যদের উন্নত ধরনের সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগ লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়াও শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা চালাইলেন। ফ্রান্সে তখন পূর্ণোদ্যমে বিপ্লব চলিতেছে এবং ব্রিটিশ শক্তির সহিত ফ্রান্সের তীব্র শত্রুতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। টিপু বিপ্লবী ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ছোট একদল ফরাসী সেনা ম্যাঙ্গালোরে অবতরণ করিল।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : সেই বৎসর লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এদেশে আসিয়া প্রথমেই তিনি টিপুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করিলেন। তিনি সুকৌশলে নিজামকে নিজের পক্ষে টানিয়া লইলেন। মারাঠারা ইংরেজদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। ওয়েলেস্‌লী তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন যে, টিপুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর তিনি মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠাদের দিয়া দিবেন। ইহার পর ওয়েলেস্‌লী টিপুর নিকট ফরাসীদের সহিত যোগাযোগের জন্য কৈফিয়ত চাহিয়া পাঠাইলেন। স্বভাবতঃই টিপুর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হইল না। ওয়েলেস্‌লী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলেন। অবশেষে ইংরেজরা শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিল। টিপু অমিত-বিক্রমে দুর্গের তোরণে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিলেন। ইংরেজ এবং নিজাম মহীশূর রাজ্যটি ভাগ করিয়া লইল। অবশ্য অধিকাংশই গেল ইংরেজের অধিকারে। মারাঠারা কোন কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। একটি ক্ষুদ্র অংশ মহীশূরের মূল হিন্দু রাজার বংশধরকে দেওয়া হইল। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল।

টিপু সুলতানের চরিত্র ও কৃতিত্ব : প্রায় সমস্ত ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখায় টিপু দুর্ধর্ষ দস্যু হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহারা টিপুকে অশিক্ষিত ও বর্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে টিপু প্রকৃত দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও ধর্মভীরু সুলতান হিসাবেই পরিগণিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে টিপু ছিলেন শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহশীল, ধর্ম ব্যাপারে উদার এবং সর্বোপরি ইংরেজদের গ্রাস হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। ফারসী, উর্দু ও কানাড়ী ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। কূটনীতি ও সামরিক দক্ষতায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজ শক্তিকে এককভাবে পরাজিত করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া তিনি ফ্রান্স, মরিশাস, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত যোগাযোগ গড়িয়া তোলেন। শেষ পর্যন্ত ঐ সব দেশ হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি মরণপণ যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইংরেজদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল সমালোচনার উর্ধ্বে। স্বয়ং মুসলমান হইয়াও তিনি হিন্দু প্রজাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। প্রকৃত বীরের ন্যায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন।

স্যার জন শোর : লর্ড কর্নওয়ালিসের পর ভারতের গভর্নর জেনারেল হইলেন নিরপেক্ষ-নীতির প্রবক্তা স্যার জন শোর। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ-নীতির বহু সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ করেন নাই। অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্ দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ওয়াজীর আলীর দাবি অস্বীকার করেন। অধিক অর্থের বিনিময়ে আসফ উদ্-দৌলার ভ্রাতা সাদাত আলীকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি নিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। কর্নওয়ালিসের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন যে, মারাঠাগণের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কিছুদিন চলিলে তাহারা অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হইয়া পড়িবে, অপরপক্ষে যে কোন শক্তিকে আক্রমণ করিলে মারাঠাগণ ও মহীশূর শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধে অগ্রসর হইবে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন মারাঠারা হায়দারাবাদের নিজাম রাজ্য আক্রমণ করিল, পূর্ব-স্বাক্ষরিত চুক্তি অমান্য করিয়া স্যার জন শোর নিরপেক্ষ রহিলেন। নিজাম খর্দার যুদ্ধে মারাঠাদিগের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লী (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) : ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল হইলেন লর্ড ওয়েলেস্‌লী। ইহার পূর্বে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্যরূপে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী। গভর্নর

জেনারেল হইয়া আসিয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। এক সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে তিনি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ-নীতির সুযোগে টিপু সুলতান শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। নিজামও খরদার যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য না পাইয়া ফরাসীদের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। কুর্গ ব্যতীত মালাবারের রাজন্যবৃন্দ এই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষণ করিতেছিলেন। কাবুলের শাসনকর্তা জামান শাহ্ ভারত আক্রমণে উদ্যত। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশর দেশের মধ্য দিয়া ভারতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।



লর্ড ওয়েলেস্‌লী

ওয়েলেস্‌লী লক্ষ্য করিলেন যে, পরস্পর বিবদমান দেশীয় নৃপতিগণ ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণে উৎসুক। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তিনি "অধীনতামূলক মৈত্রী" (Subsidiary Alliance) নামে এক ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। এই মৈত্রী নীতি অনুযায়ী যে সকল দেশীয় নৃপতি ইংরেজ কোম্পানীর সহিত "অধীনতামূলক মৈত্রী" চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন, কোম্পানী তাঁহাদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বিনিময়ে তাঁহারা কোম্পানীর অজ্ঞাতে কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ অথবা আলাপ-আলোচনা করিতে পারিবেন না। প্রধান রাজ্যগুলিকে শান্তিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সেনাপতির পরিচালনাধীনে দেশীয় সৈন্যদল রাখিতে হইবে এবং সৈন্য-বাহিনীর পোষণের জন্য রাজ্যের একাংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই চুক্তিবদ্ধ নৃপতিরা নিজ নিজ সেনাবাহিনী রাখিতে পরিবেন কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর পরিচালনভার ইংরেজ সেনাপতিদের ছাড়িয়া দিতে হইবে।

হায়দারাবাদের নিজাম ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে সাময়িকভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া মহীশূরের টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। ইহার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপাকিভাবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তিনি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহার পর অযোধ্যার নবাব অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার জন্য তিনি গোরক্ষপুর, রোহিলখণ্ড ও দোয়াবের একাংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিলেন।

মারাঠা শক্তিসংঘ কর্তৃক ইংরেজ শক্তির প্রতিরোধ

সলবাই-এর সন্ধির (১৭৮২ খ্রীঃ) পর বিশ বৎসর ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ ঘটে নাই। এই সময় মারাঠা শক্তিসংঘের মধ্যে আত্মকলহের অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, মারাঠাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নাই। সলবাই সন্ধির নায়ক মহাদজী সিন্ধিয়া ছিলেন এই সময়কার সবচেয়ে ক্ষমতাবান নেতা। উত্তর ভারতে তিনি প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দিল্লীতে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া তিনি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে ক্রীড়নকে পরিণত করিয়া নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। রাজপুত ও মারাঠাদের উপরও তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করেন। পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ নানা ফড়নবীশের প্রাধান্য হ্রাস করিবার জন্য তিনি পুনার দিকে সসৈন্য অগ্রসর হন। কিন্তু পুনায় পৌঁছাইয়া হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৯৪ খ্রীঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর নানা ফড়নবীশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ হায়দারাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। নিজাম খরদার যুদ্ধে (১৭৯৫ খ্রীঃ) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া রাজ্যের বহু স্থান ছাড়িয়া দিয়া নানা ফড়নবীশের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন। এই জয়লাভের ফলে মারাঠাদের শক্তি আরও বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে নূতন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবং নানা ফড়নবীশের মধ্যে বিরোধের ফলে পুনায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত নানা ফড়নবীশ দ্বিতীয় বাজীরাওকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দ্বিতীয় বাজীরাও নানা ফড়নবীশকে নিজের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সময় হইতেই মারাঠা শক্তি পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল। অল্পকালের মধ্যেই নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হইল (১৮০০ খ্রীঃ)। মারাঠাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদক্ষ শাসক এবং এই দূরদর্শী রাজনীতিকের মৃত্যুতে মারাঠাশক্তির অপূরণীয় ক্ষতি হইল। নানা ফড়নবীশ কখনও কোন ব্যাপারে



নানা ফড়নবীশ

ইংরেজদিগকে হস্তক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ দেন নাই। তাঁহার দেশপ্রেম ও মারাঠাশক্তিকে রক্ষা করিবার আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা নানা ফড়নবীশ ভারতের ইতিহাসে এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন।

একে একে মহাদজী সিন্ধিয়া, অহল্যা বাঈ, নানা ফড়নবীশ প্রভৃতির মৃত্যুতে মারাঠা শক্তি একেবারে নেতৃত্বহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ: দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের মন্ত্রী নানা ফড়নবীশ মারাঠাদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিয়া ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হইল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলতরাও সিন্ধিয়া সকলেই মারাঠারাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়া এবং পেশোয়া বাজীরাও-এর যুগ্মবাহিনীকে পরাজিত করিয়া যশোবন্ত রাও পুনা অধিকার করিয়া বিনায়ক রাওকে পেশোয়া পদে স্থাপন করিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বেসিনের সন্ধি দ্বারা (১৮০২ খ্রীঃ) বাজীরাও অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া ইংরেজদের সাহায্যে পুনরায় পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মারাঠাদের স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্য অর্জন করিলেন। একদল ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া তিনি পুনায় প্রবেশ করিলেন এবং পেশোয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

বেসিনের চুক্তি পেশোয়াতন্ত্রের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া মারাঠাজাতির মস্তক হেঁট করিয়া দিল। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের পথ বাছিয়া লইলেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩ খ্রীঃ) শুরু হইল। ইংরেজ সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ওয়েলেস্লীর ভ্রাতা (তিনি নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন) আর্থার ওয়েলেস্লী এবং লেক। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার বাহিনী পরাজিত হওয়ায় তাঁহারা ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার এতদিন নিরপেক্ষ দর্শকের মত চুপচাপ ছিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার বাহিনী যখন বিধ্বস্ত হইল, তখন তিনি যুদ্ধে নামিলেন। প্রথমদিকে সাফল্য লাভ করিলেও তিনি সেনাপতি লেকের নিকট পরাজিত হইয়া অমৃতসরে পলায়ন করিলেন। হোল্কারের সহিত ইংরেজদের সন্ধি হইল (১৮০৬ খ্রীঃ)। এইভাবে একে একে ভোঁসলা, সিন্ধিয়া ও হোলকার অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পর মারাঠা শক্তি চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়িল। জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থান ইংরেজদের

অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় ভরতপুর, বুন্দি প্রভৃতি রাজ্যও ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিল।

ইহার পর তাঞ্জোরের রাজাও অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলী ছিলেন ইংরেজদের আশ্রিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উম্‌দাত-উল্ উমরা ইংরেজ অধীনতামুক্ত হইবার জন্য মহীশূরের টিপু সুলতানের সহিত গোপনে যোগাযোগ শুরু করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ওয়েলেস্‌লী কর্ণাটক রাজ্যটিকে অধীনে লইয়া আসিলেন এবং উম্‌দাতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের দাবিকে উপেক্ষা করিয়া নিজ মনোনীত এক ব্যক্তিকে কর্ণাটকের নবাবপদে স্থাপন করিলেন।

ওয়েলেস্‌লীর কৃতিত্ব: কোম্পানীর শাসনের এক সঙ্কটময় কালে ওয়েলেস্‌লী ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তৎপরতায় কোম্পানী সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। ইংরেজদের সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁহার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মহীশূর রাজ্যের পতন ও মারাঠাশক্তির বিনাশ সাধনে তাঁহার কৃতিত্ব নিতান্ত সামান্য ছিল না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে পরস্পর বিদ্বেষ ও অনৈক্যের যে রোগ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার সুযোগে তিনি ইংরেজদের প্রতাপবৃদ্ধিকরার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধীনতামূলক মৈত্রীর নীতির দ্বারা তিনি দেশীয় রাজাদের অধিকাংশকে ইংরেজ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতীয়দের দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার স্বার্থপর নীতিকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ওয়েলেস্‌লী ছিলেন একজন মহারথী। তিনি ভারতে ফরাসীদের প্রভাবের পথ বন্ধ করিয়া দেন। নেপোলিয়নের অগ্রগতি রোধ করার জন্য সুদূর মিশরে একদল সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য নেপোলিয়ান মিশর ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তাহাদের কোন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলমকে ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে আনিয়া তিনি দিল্লীতে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি দেশ শাসনে অবহেলা দেখান নাই। নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি ও রাজ্যবিস্তারের ফলে কোম্পানীর ঋণভার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণেই তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিস্ (১৮০৫ খ্রীঃ) ও স্যার জর্জ বার্লো (১৮০৫-১৮০৭খ্রীঃ): ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেস্‌লীর পরিবর্তে কর্নওয়ালিস্‌কে দ্বিতীয়বার গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতে পাঠানো হইল। কোম্পানীর পক্ষ

হইতে তাঁহাকে কোনরূপ যুদ্ধ বা রাজনৈতিক জটিলতায় জড়াইয়া না পড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কর্নওয়ালিস্ শান্তি নীতির পক্ষপাতী হিসাবে পূর্ব-অনুসৃত হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি হোলকার ও সিন্ধিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং সিন্ধিয়ার রাজ্যের অধিকাংশ স্থান ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু মাত্র চারমাসের মধ্যেই গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ইহার পর কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য স্যার জন বার্লো অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসন-দক্ষতার ফলে কোম্পানীর আয়ের ঘাটতি পড়া বন্ধ হইল। তিনি সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া চম্বল নদীর দক্ষিণাংশ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। রাজপুত প্রধানদের সহিত তিনি সন্ধি স্থাপন করিলেন। তাঁহার সময়েই হোলকার লর্ড লেকের নিকট পরাজিত হইলেন; কিন্তু বার্লো তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলে তিনি দৃঢ়হস্তে নিজামকে বাধা দিলেন। ✓

লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৮১৩ খ্রীঃ) : বার্লোর পর স্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসাবে আসিলেন লর্ড মিণ্টো। তিনিও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে. সেই সময়ের পরিস্থিতিতে কোম্পানীর পক্ষে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভব হইবে না। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মিণ্টো ডেনমার্কের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে দিনেমারদের শেষ ঘাঁটি শ্রীরামপুর অধিকার করিয়া লইলেন। পারস্যে যাহাতে ফরাসীদের প্রভাব বিস্তারলাভ না করিতে পারে সেজন্য সেখানে দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। আফগানিস্তানে রাজনৈতিক গণ্ডগোল সত্ত্বেও সে দেশে ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি দূত পাঠাইলেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল স্যার চার্লস মেটকাফ্‌কে শিখবীর রণজিৎ সিংহের রাজসভায় প্রেরণ করা এবং এমন একটি চুক্তি সম্পাদন করা যাহার ফলে শতদ্রু নদী পর্যন্ত কোম্পানীর অধিকার বিস্তৃত হইল (১৮০৯ খ্রীঃ)। ইহা ছাড়া মিণ্টো জাভা দখল করিয়া ভারত মহাসাগরে ফরাসীদের প্রভাব কিছুকালের জন্য খর্ব করিতে সক্ষম হইলেন।

লর্ড ময়রা অথবা লর্ড হেস্টিংস্ (১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) : ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা ভারতের গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল প্রধানতঃ দুইটি কারণে বিখ্যাত—নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তৃতীয় বা শেষ মারাঠা যুদ্ধ।

নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী গোরক্ষপুর জিলাটি

অধিকার করিলে কোম্পানীর রাজ্যের উত্তর সীমা নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমা সংলগ্ন হয়। ইহার ফলে গুর্খা ও ইংরেজদের মধ্যে বারে বারে সংঘর্ষ দেখা দেয়। লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে গুর্খাগণ ভুটোয়ালী এবং শিত্তুরাজ অধিকার করিলে ইংরেজ কোম্পানী যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাইতে থাকে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হইবার পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি অক্টারলোনি গুর্খাদের পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। **সগৌলির সন্ধি** দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজগণ কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলার অধিকার লাভ করিল। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখিবার শর্ত স্বীকৃত হইল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে অপর একটি চুক্তির দ্বারা সিকিমের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইল। গুর্খা যুদ্ধে সাফল্যের জন্য লর্ড ময়রাকে মারকুয়েস অব হেস্টিংস্ উপাধি দেওয়া হইল।

পিণ্ডারী দমন ঃ ভারতে প্রধান শক্তিগুলি যখন একে একে ইংরেজদের আধিপত্য মানিয়া লইতেছিল, মধ্য ভারতে তখন পিণ্ডারী ও পাঠান লুণ্ঠনকারীরা অরাজকতা চালাইতেছিল। নেপাল যুদ্ধের অবসানের পর লর্ড হেস্টিংস্ প্রধান ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া এক বিশাল সৈন্যদলের সাহায্যে পিণ্ডারীদের দমন করিলেন (১৮১৭-১৮ খ্রীঃ) এবং তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে দক্ষিণ-বিহার, মির্জাপুর ও উত্তর সরকার প্রভৃতি অঞ্চলকে রক্ষা করিলেন।

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ঃ অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হওয়ার পর পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মন্ত্রী **ত্রিম্বকজী** ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য হোলকার, পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহিত গোপন আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও নিজেও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ইংরেজদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরেজগণ পেশোয়াকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে পেশোয়াকে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে এবং কোঙ্কণ এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকার সমর্পণ করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু মারাঠা প্রধানগণ এই অধীনতা সহজে মানিয়া লইলেন না। পেশোয়ার নির্দেশে পুনায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের আবাসে অগ্নিসংযোগ করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সহিত ব্রিটিশের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পুনা আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজীরাও পুনা ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ পুনা দখল করিল। ইহার পর ইন্দোরের হোলকার ও নাগপুরের ভোঁসলে ব্রিটিশ সৈন্যের নিকট পরাজিত

হইলেন। কোরিগাঁও এবং অশ্‌তির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পেশোয়ার মন্ত্রী গোক্‌লা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাওকে বাৎসরিক ভাতা দিয়া বিটুর নামক স্থানে অন্তরীণ রাখা হইল। ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্য শিবাজীর এক বংশধরকে প্রদান করিয়া মারাঠাদিগকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হইল। ভোঁসলার রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে কোন বহিঃশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিষিদ্ধ করা হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং মারাঠা রাজ্য ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আনিয়া লর্ড হেস্টিংস ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন।

লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ) : লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব সীমান্তে আসাম ও ব্রহ্মরাজ প্রায়ই ব্রিটিশ সীমা লঙ্ঘন করিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শিখ, সিন্ধী, বালুচ, পাঠান ও আফগানরা প্রায়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করিত। আমহার্স্ট এই দেশে আসিয়াই ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ: ইংরেজরা সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য চালাইতেছিল। কিন্তু উভয় রাজ্যের সীমা যে সময় হইতে সংলগ্ন হইয়া পড়িল সেই সময় হইতেই উভয় পক্ষে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘটিল। ব্রহ্মদেশের রাজা **বোদোপায়া** (১৭৭৯-১৮১৯ খ্রীঃ) এবং তাঁহার পুত্র **পগিদোয়া** রাজধানী আভা হইতে শাসন চালাইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোদোপায়া ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর দখল করেন। আরাকানের রাজা মধ্যযুগে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। এই যুক্তিতে বোদোপায়া ঐ সব স্থানের উপর অধিকার দাবি করিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই দাবি অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ হইতে ছয়বার ব্রহ্মদেশের রাজসভায় দূত প্রেরণ করা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পগিদোয়ার সৈন্যদল আসাম দখল করিল এবং চট্টগ্রামের নিকটস্থ একটি ছোট দ্বীপ দখল করিয়া খাস বাংলাদেশ আক্রমণের তোড়জোড় চালাইতে লাগিল। গভর্নর-জেনারেল আমহার্স্ট আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইহার সমাধান করিবার জন্য যখন চেষ্টা করিতেছেন তখন ব্রহ্মদেশীয়রা দুইজন ইংরেজকে বন্দী করিলে যুদ্ধ ছাড়া কোন গত্যন্তর রহিল না। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। **যান্দাবুর** (Yandaboo) **সন্ধি** অনুসারে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ব্রহ্মরাজকে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে হইল এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইল। রাজধানীতে ইংরেজ প্রতিনিধি (Resident) বসানো সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশ প্রথমে আপত্তি করিলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মানিয়া লইল। আসাম, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও ইংরেজদের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তৃত হইল।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ও বেতনের স্বল্পতা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে সিপাহীদের ছাউনিতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। ইংরেজরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিল। ভরত-পুর রাজ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে ইংরেজরা এই সময় হস্তক্ষেপ করিয়া রাজ্যটিকে ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে আনিতে সমর্থ হইল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮—৩৫ খ্রীঃ) : লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল রাজস্ব, বিচার ব্যবস্থা, সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে। বেণ্টিঙ্ক দেশীয় রাজন্যদের প্রতি শান্তি-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি স্থানে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কুর্গ রাজ্যের প্রজারা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে বেণ্টিঙ্ক কুর্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কাছাড় রাজ্যের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় ঐ রাজ্যটিও তিনি কোম্পানীর অধিকারে আনেন। আসামের জয়ন্তিয়া অঞ্চলে নরবলি প্রথা রোধ করার জন্য ঐ স্থানটিকে কোম্পানীর অধীনে আনা হইয়াছিল। অবশ্য ভারতের জনসাধারণের শুধু মঙ্গলের ইচ্ছা লইয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে কম অবহিত হইয়া তিনি এইসব হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এধরনের ধারণা করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে রাশিয়ার ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টায় বিরাট ভীতির সৃষ্টি করে। উহা প্রতিহত করিবার জন্য বেণ্টিঙ্ক পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতা স্থাপন করেন। একই কারণে বেণ্টিঙ্ক সিন্ধুদেশের আমীরের সঙ্গে মিত্রতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।



লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক

শিখগণ কর্তৃক ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধ

রঞ্জিৎ সিংহ ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিখগণ বারটি মিস্‌ল বা সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল। রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন সুকারচুকিয়া নামক মিস্‌লের অধিপতি মহাসিংহের পুত্র। বারো বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে রঞ্জিৎ সিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। কাবুলের জামান শাহ্‌ ভারত আক্রমণ করিলে রঞ্জিৎ সিংহ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তোলেন। জামান শাহ্‌ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। জামান শাহ্‌ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া (১৭৯৯ খ্রীঃ) গেলে রঞ্জিৎ সিংহ লাহোর দখল করিয়া লইলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রঞ্জিৎ সিংহকে জামান শাহ্‌ এক ফরমান দ্বারা লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লাহোর দখল করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি দখল করিয়া জম্মুর দিকে অগ্রসর হইলেন। জম্মুর রাজা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু টাকা দিয়া এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর দখল করার পর রঞ্জিৎ সিংহের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের সব কয়টি শিখ মিস্‌ল বা সামন্তরাজ্য দখল করিয়া নিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা দখল করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় শতদ্রু অতিক্রম করিয়া সেই স্থানের শিখ সর্দারদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে উদ্যোগ লইলেন। কিন্তু শিখ সর্দারগণ রঞ্জিৎ সিংহের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাইয়া ভীত হইলেন এবং ইংরেজদের শরণাপন্ন হইলেন।



রঞ্জিৎ সিংহ

ইংরেজ পক্ষও রঞ্জিৎ সিংহের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মিণ্টো। তিনি এই সুযোগে একদল ইংরেজ সৈন্যকে রঞ্জিৎ সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে (১) শতদ্রু নদী রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যের পূর্বসীমারেখা বলিয়া নির্ধারিত হইল এবং (২) উভয় পক্ষ স্থায়ী

মৈত্রী বজায় রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। এই সন্ধির ফলে যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং শিখজাতি দ্বিধাবিভক্ত হইল।

এইভাবে পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় অন্যদিকে রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ১৮১১ সালে কাংড়া, ১৮১৩ সালে আটক, ১৮১৮ সালে মুলতান এবং ১৮১৯ সালে কাশ্মীর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। পেশোয়ার তাঁহার প্রভাবাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। তাঁহার রাজ্য খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাকে স্থায়ী করিবার জন্য পুনরায় অমৃতসরের সন্ধিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উনষাট বৎসর বয়সে রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হইল।

কৃতিত্ব ঃ সামরিক কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহ শাসন দক্ষতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার কোন ভেদাভেদ ছিল না। সামরিক বাহিনীকে সুসংগঠিত করিবার জন্য তিনি ইউরোপীয়গণের সাহায্য লইতে দ্বিধা করেন নাই। বিদেশীদের সাহায্য সত্ত্বেও "খালসা" বাহিনীর জাতীয়তাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান শিখজাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য গঠন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আংশিকভাবে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছিল।

তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক এবং পরধর্মসহিষ্ণু। শাসক হিসাবে তিনি স্বৈরাচারী হইলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বহু বিদেশী পর্যটক তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকিমোঁ তাঁহাকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের "ক্ষুদ্র সংস্করণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণ ঃ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়ক সিংহ পাঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে শিখরাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। খড়ক সিংহের মৃত্যুর পরদিনই তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নাও-নিহল সিংহের আকস্মিক মৃত্যু হইল। রঞ্জিৎ সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন (১৮৪৩ খ্রীঃ)। এই অবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী—"খালসা" রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া সর্বেসর্বা হইয়া বসিল। তাহারা রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজেরাই শাসন পরিচালনা করিতে লাগিল। রানীমাতা ঝিন্দন দলীপ সিংহের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রহিল দুই সেনানায়ক লাল সিংহ ও তেজ সিংহের হাতে।

পরবর্তী গভর্নর জেনারেলগণ ঃ বেন্টিঙ্কের পর চার্লস মেটকাফ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনি ভারতের সংবাদপত্রগুলির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার উদারনৈতিক নীতি ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর সভার পছন্দ না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর **লর্ড অকল্যাণ্ড** (১৮৩৬-৪২ খ্রীঃ) পাঞ্জাবের কার্নুল রাজ্যের নবাবকে পদচ্যুত করিয়া ব্রিটিশ বিরোধী কাজের শাস্তিস্বরূপ রাজাটি দখল করিয়া লইলেন। তাঁহার শাসনকাল **প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের** জন্য বিখ্যাত। ইংরেজদের মনে সর্বদাই এই ভয় ছিল যে রাশিয়া এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ প্রাধান্য খর্ব করিতে তৎপর। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য কাবুল দখল করিয়া দোস্ত মহম্মদকে পদচ্যুত করিল এবং বন্ধুভাবাপন্ন শাহ সুজাকে সিংহাসনে বসাইল। কিন্তু আফগান জাতি এই অন্যায় সহ্য করিল না। তীব্র সংগ্রাম করিয়া শুধু তাহারা শাহ সুজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল না, ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করিল। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল **লর্ড এলেনবরা** (১৮৪২-৪৪ খ্রীঃ) ইংরেজ বাহিনীকে আফগানিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। এলেনবরার শাসনকালে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল **লর্ড হার্ডিঞ্জের** (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ) শাসনকালে শিখদের সহিত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাধিল।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ঃ লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল প্রথম শিখযুদ্ধ। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। শিখরাজ দলীপ সিংহ ছিলেন নাবালক। তাঁহার মাতা ঝিন্দন নিজ পুত্রের হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময় খালসা বাহিনী দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল এবং রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হইয়া শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের দমন করিবার উপায় হিসাবে লাহোর দরবার ইংরেজদের সহিত খালসা বাহিনীকে সংঘর্ষে লিপ্ত করিবার পরিকল্পনা করিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে খালসা বাহিনী শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিলে **প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ** শুরু হইল। মুদকী, ফিরোজ শা, জালিওয়ান ও সোব্রাওঁ-এর যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট খালসা বাহিনী পরাজিত হইল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী লাহোর দখল করিল। পরাজিত শিখগণ ইংরেজদের সহিত **লাহোরের সন্ধি** স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে (১) ব্রিটিশ সরকারকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও কাশ্মীর রাজ্যটি ছাড়িয়া দিতে হইল, (২) শিখ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইল এবং (৩) লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখিবার ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাবে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) : লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেস্টিংসের ন্যায় তিনিও ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। জনসাধারণের চিন্তাধারার প্রতি তিনি কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার শাসন-কালে ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ, দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছিল।


লর্ড ডালহৌসী

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ : প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর লাহোরের সন্ধির শর্তাবলীতে শিখগণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহাদের জাতীয়তাবোধের চেতনায় ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। নূতন করিয়া ইংরেজ-দের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শীঘ্রই যুদ্ধের কারণও উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছেন এই অজুহাতে রানীমাতা ঝিন্দনকে চুনারের দুর্গে নির্বাসিত করা হইল। এই অপমানের প্রতিক্রিয়া সমগ্র পাঞ্জাবে তীব্র আকার ধারণ করিল। ঠিক এই সময়ে মুলতানের শিখ শাসনকর্তা মুলরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। মুলরাজের স্থলে অপর এক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইলে মুলরাজ দুইজন ইংরেজকে নিহত করিলেন। মুলরাজকে দমন করিবার জন্য শের সিংহকে পাঠানো হইল। কিন্তু শের সিংহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। মুলতানের বিদ্রোহকে উপলক্ষ করিয়া শিখদের জাতীয় সংগ্রাম শুরু হইল। লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধের ফলে (১) সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, (২) দলীপ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সামান্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইল, (৩) খাল্‌সা বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে স্বাধীন শিখরাজ্যের অবসান ঘটিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ : প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের পর ব্রহ্মদেশের রাজসভায় একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মদেশেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বাধ্য হইয়া ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিলেন। উহার

কিছু দিনের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মাদের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৫২ খ্রীঃ)। কয়েক-মাসের মধ্যেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইরাবতী উপত্যকার প্রধান শহরগুলি অধিকার করিল। কিন্তু কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল না। লর্ড ডালহৌসী একটি ঘোষণা দ্বারা পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইল।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে সিকিম রাজ্যের একাংশ ইংরেজ অধিকারে আসিল। দুইজন ইংরেজ কর্মচারীকে সিকিম রাজ্যে বন্দী করিয়া রাখিলে ইংরেজদের সঙ্গে সিকিম রাজ্যের দ্বন্দ্ব বাধিল। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত সিকিমরাজকে তাঁহার রাজ্যের একাংশ ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে হইল।

স্বত্ব-বিলোপ নীতিঃ লর্ড ডালহৌসী স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। বহু দেশীয় রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের দখলে চলিয়া গেলেও তখনও কিছু দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলি ইংরেজদের আশ্রিত ছিল। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালের বহু পূর্বে ইংলণ্ডের ডাইরেক্টরগণ ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি না দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর আমলে বহু দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন। ফলে স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, জৈৎপুর, উদয়পুর প্রভৃতি ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়া ঐ দুই রাজ্যের রাজাদিগকে বাৎসরিক ভাতা দিবার শর্তে রাজ্য দুইটিকে ডালহৌসী অধিকার করিয়া লইলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পুত্র নানা সাহেবের ভাতা তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন, কেননা তিনি ছিলেন দত্তকপুত্র। ইহা ভিন্ন কুশাসন সংক্রান্ত প্রশ্নে অযোধ্যাও অধিকার করা হইল। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যের খরচ সময়মত না দেওয়ায় বেরার প্রদেশটি ডালহৌসী অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে ডালহৌসীর আমলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি আরও বিস্তারলাভ করিল। তাঁহার এই সকল কার্যকলাপ ভারতের নৃপতিদের মধ্যে দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিল। তাঁহাদের রাজ্যগুলিও ইংরেজরা দখল করিয়া লইবে এই ধরনের আশঙ্কা তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। এই সকল কারণ লর্ড ডালহৌসীর আমলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

লর্ড ক্যানিংঃ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে (১৮৫৬-৬২ খ্রীঃ) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ।

বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণঃ এই মহাবিদ্রোহের পটভূমিকা বহু কারণে বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামরিক কারণে ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এই প্রতিক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত মহাবিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে।

ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে আশঙ্কা ও ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। এই নীতির প্রয়োগ করিয়া সাতারা, নাগপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর, বেরার প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পুত্র নানা-সাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল কারণে দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভীতি ও আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই মহাবিদ্রোহের পশ্চাতে **অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও** ছিল। ইংরেজরা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি চরম উপেক্ষা করিয়া দীর্ঘ একশত বৎসরের অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা চরম দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছিল। বহুক্ষেত্রে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষকদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য, প্রাচীন জমিদার পরিবারগুলির বিলুপ্তিসাধন প্রভৃতি বিবিধ কারণে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল। কৃষির উপর অত্যধিক চাপ এবং কৃষির উন্নয়নে সরকারের উদাসীনতা সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের অপমৃত্যুর ফলেও শিল্পজীবীদের আর্থিক দুর্গতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

দেশীয় সৈন্যদের অবস্থাও ছিল খুব শোচনীয়। ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় তাহাদের বেতন ছিল খুবই কম। দেশীয় সৈন্যদের প্রতি সরকারের বৈষম্য-মূলক আচরণ, ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিজিত ভারতবাসীর প্রতি বিজয়ী ব্রিটিশ-শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণার মনোভাব ভারতবাসীর মনে গভীর বেদনার উদ্রেক করিয়াছিল। ইংরেজরা ভারতীয়দের সাধারণভাবে বর্বর ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। হিন্দু ধর্মের ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের নিন্দা ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান গড়িয়া তুলিতেছিল। এইসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রচলন, সতীদাহ-নিবারণ, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপন প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

মহাবিদ্রোহের মূলে **ধর্মনৈতিক কারণও** ছিল। বিদেশীয় সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি ভারতবাসীর মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল।

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার, হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ইংরেজদের উদ্দেশ্য হইল ভারতবাসীকে ধর্মান্তরিত করা।

উপরিউক্ত কারণসমূহ মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু যতদিন ভারতীয় সিপাহীগণ ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ছিল ততদিন বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হইবার সাহস পায় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে সিপাহীগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ: এইরূপ পরিস্থিতিতে এনফিল্ড রাইফেল নামে এক ধরনের বন্দুক প্রবর্তন করা হইল। এই বন্দুকের টোটা দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকের নলে পুরিতে হইত। এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে এই ধরনের কথা সিপাহীদের মধ্যে প্রচারিত হইল। ফলে ধর্মনাশের ভয় হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে সর্বত্র দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল।

বিদ্রোহ: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারিখে চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর সেনানিবাসে **মঙ্গল পাণ্ডে** নামে জনৈক সিপাহী চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার করিতে অসম্মত হইল ও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ইহার



রানী লক্ষীবাঈ

পর সমগ্র ভারতে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সরকার পল্টনটি ভাঙ্গিয়া দিয়া মঙ্গল পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। ইহাতে বিদ্রোহ দমন করা গেল না। মীরাট, ঝাঁসি, ফিরোজপুর, মুজফ্‌ফরপুর, নৌসেরা, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, কানপুর, প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের **কুনওয়ার সিং**, কানপুরের **নানা সাহেব**, **তাঁতিয়া তোপী** বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহের প্রথমদিকে অপ্রস্তুতির জন্য ব্রিটিশ পক্ষ একের পর এক পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাপতিদের কর্মদক্ষতায়, শিখ ও নেপালী সৈনিকদের সহায়তায় এবং একাধিক দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তায় বিদ্রোহ দমন করা সহজ হয়। এই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকার নৃশংস অত্যাচারের পথ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা মুঘল বংশের শেষ বংশধর **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে** ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। দিল্লী অধিকার করিয়া ইংরেজরা বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করিল এবং তাঁহার দুই পুত্র এবং পৌত্রগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইল। রেঙ্গুনে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে মুঘল বংশের অবসান ঘটিল।



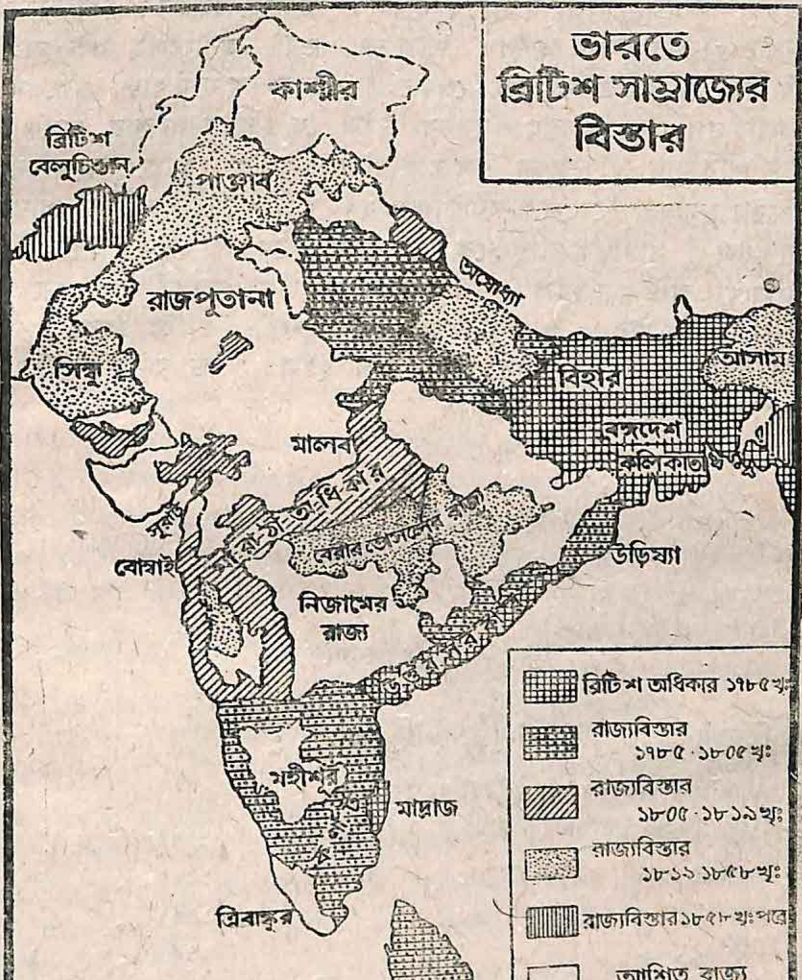
নানাসাহেব

বিদ্রোহের স্বরূপঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রো কে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ **সিপাহী বিদ্রোহ** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অবশ্য কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে এই বিদ্রোহ সিপাহীগণ কর্তৃক শুরু হইলেও পরবর্তীকালে তাহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। সাভারকর প্রমুখ ভারতীয় দেশপ্রেমিকগণ ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে **প্রথম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিরপেক্ষ বিচারে বলা যায় যে এই বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও কোন কোন অঞ্চলে উহা জাতীয় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে।



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌

ফলাফল ঃ কোম্পানীর শাসনের অবসান ঃ মহাবিদ্রোহ ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল। ব্রিটিশ শাসকগণ এযাবৎ অনুসৃত শাসননীতির মৌলিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করিলেন এবং



শাসনপদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হইলেন। কোম্পানীর বণিক-মনোবৃত্তি জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ সরকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর শাসনভার ছাড়িয়া রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। এই কারণে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে

এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের রানীর হস্তে অর্পণ করিলেন। বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোলের স্থলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মন্ত্রীদের মধ্যে একজনকে ভারত-সচিবের পদে (Secretary of States for India) নিযুক্ত করিলেন এবং ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এক কাউন্সিলের সাহায্যে তাঁহাকে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। ভারতে একজন **রাজপ্রতিনিধি** (Viceroy) নিযুক্ত করা হইল। ভারতের গভর্নর জেনারেলই এই রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় নাম ধারণ করিলেন। ভারতের নৃপতিদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, ব্রিটিশ সরকার স্বত্বলোপ নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং রাজারা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভারতের জনসাধারণকে শাসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশ দিবার নীতিও ঘোষণা করা হইল। সামরিক বাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করা হইল। ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইল। সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ভার ইউরোপীয় কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হইল। লর্ড ক্যানিং সর্বপ্রথম ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) :

1. সঠিক উত্তর টিক (√) দিয়া বুঝাইয়া দাও :

(i) পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে □
- ১৬৫৭ " □
- ১৭৫৭ " □
- ১৭৫৪ " □

(ii) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে

- ১৮৬৫ " □
- ১৭৫৬ " □
- ১৭৬৫ " □
- ১৭৫৭ " □

(iii) অত্যাচার ও অবৈধ আচরণের জন্য লর্ড সভায় অভিযুক্ত (বা ইম্পীচ) করা হয়।

- লর্ড ক্লাইভকে □
- লর্ড ডালহৌসীকে □
- ওয়ারেন হেষ্টিংসকে □

(iv) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ঃ

ইংরেজ ও হায়দর আলীর মধ্যে ☐
ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে; ☐
ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে ☐

(v) ১৮৫৮ সাল হইতে ভারতে নিযুক্ত রাজ প্রতিনিধির নাম হইল ঃ

ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ☐
ভাইসরয় ☐
গভর্নর জেনারেল ☐

2. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(i) —যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন।

(ii) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়া ছিল তাহা — শাসনব্যবস্থার কুফলের চরম প্রকাশ। এই দুর্ভিক্ষ — — নামে ইতিহাসে পরিচিত।

(iii) — খ্রীষ্টাব্দে — সন্ধি দ্বারা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

(iv) লর্ড ওয়েলেসলী — — কে বেসিনের চুক্তি দ্বারা অধীনতামূলক মৈত্রী গ্রহণে বাধ্য করিলেন।

(v) লর্ড ডালহৌসী — খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

(vi) বেন্টিঙ্ক কর্ণেল শ্লীম্যানের সাহায্যে — দমন করিয়া পথ চলার বিপদ দূর করেন। ডালহৌসীর শাসনকালে।— এক নির্দেশনামায় ভারতের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করিতে বলেন। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য — 'হাণ্টার কমিশন' নামে এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) ঃ

(1) ঘেরিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব কি? (2) সিরাজ-উদ্-দৌলার চরিত্র আলোচনা কর। (3) পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর। (4) মীরকাশিমকে বাংলার স্বাধীন নবাব বলা যায় কি? (5) লর্ড ক্লাইভের দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব কি ছিল? (6) "দ্বৈত শাসন" বলিতে কি বুঝ? (7) ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত (ইম্পীচ) করা হইয়াছিল কেন? (8) হায়দার আলীর চরিত্র বিচার কর। (9) 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' বলিতে কি বুঝ? (10) ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর। (11) রঞ্জিৎ সিংহের চরিত্র আলোচনা কর। (12) 'স্বত্ব বিলোপ' নীতি বলিতে কি বুঝ?

রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay Type Questions) ঃ

1. বাংলার নবাব হিসাবে আলিবর্দী খাঁ-র পরিচয় দাও।
2. রবার্ট ক্লাইভের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
3. সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ ও তাহার ফলাফল আলোচনা কর।

4. ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে দৃঢ় করার ব্যাপারে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা আলোচনা কর।

5. মহীশূরের স্বাধীন সুলতান হিসাবে হায়দার আলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

6. ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সংঘর্ষ ও তাহার ফলাফল আলোচনা কর।

7. লর্ড ওয়েলেসলীর 'অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি' সম্বন্ধে কি জান? ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারে কতদূর সফল হইয়াছিল?

8. ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধে মারাঠাদের ভূমিকা আলোচনা কর। তাহাদের ব্যর্থতার কারণ কি?

9. রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

10. লর্ড ডালহৌসীর "স্বত্ববিলোপ নীতি" সম্বন্ধে কি জান? ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল?

11. ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বড়লাটের শাসনাধীন ভারতবর্ষ

লর্ড এলগিন হইতে লর্ড কার্জন

লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৪ খ্রীঃ) : লর্ড ক্যানিং-এর পর গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হইলেন লর্ড এলগিন (প্রথম)। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল।

লর্ড লরেন্স (১৮৬৪-৬৯ খ্রীঃ) : ইহার পর স্যার জন লরেন্স ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হইলেন। লরেন্স ভুটানরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ভুটানীরা বাংলা দেশের সীমানায় হানা দিত। আলাপ আলোচনার দ্বারা ইহার সমাধানে ব্যর্থ হইয়া লরেন্স ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত বাৎসরিক কর দিবার শর্তে ইংরেজগণ ভুটানের রাজার নিকট হইতে ডুয়ার্স অঞ্চল অধিকার করিয়া লন।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২ খ্রীঃ) : পরবর্তী ভাইসরয় মেয়োর শাসনকালে কয়েকটি রাজস্ব বিষয়ক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার সময়েই ভারতে প্রথম লোক গণনা করা হয়। আন্দামানে এক পাঠান আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন।

লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬ খ্রীঃ) : ইহার পর লর্ড নর্থব্রুক ভাইসরয়ের পদে নির্বাচিত হন। তাঁহার শাসনকালে বরোদার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রহস্যজনকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লর্ড নর্থব্রুক ইহার জন্য বরোদার গাইকোয়াড়কে সন্দেহ করেন এবং তাঁহাকে গদিচ্যুত করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ (পরবর্তিকালে ৭ম এডওয়ার্ড) ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন লর্ড লিটন।

লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০ খ্রীঃ) : লর্ড লিটন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতে আসিয়া রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুযায়ী আফগানিস্তান সম্পর্কে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। ইহার ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ **দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ** নামে পরিচিতি লাভ করে। এই যুদ্ধের ফলে কোয়েটা এবং বোলান গিরিপথের **উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল।** লিটন ছিলেন একজন ঘোর

সাম্রাজ্যবাদী। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Vernacular Press Act (দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন) পাশ করেন। তাঁহার শাসনকালে মহীশূর, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি দুর্ভিক্ষ আইন রচনা করেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে রেলপথও সম্প্রসারিত হয়। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট Royal Title Act পাশ করে এবং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে "ভারত সম্রাজ্ঞী" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ): লর্ড রিপন যখন ভারতবর্ষে শাসন করিতে আসেন তখন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার উপর ভারতীয়দের কোনরূপ আস্থা ছিল না। ইংরেজ কর্মচারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। লর্ড রিপন কার্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই আফগান আমীর শের আলির পুত্র আয়ুব খাঁ কান্দাহারে অবস্থিত ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। সেনাপতি রবার্টস অবশ্য কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া আয়ুব খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এই জয়লাভে শের খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহমান ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লর্ড রিপন আব্দুর রহমানকে আফগানিস্তানের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। আব্দুর রহমান ও ইংরেজদের মধ্যে এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে ইংরেজরা আব্দুর রহমানকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইল। পক্ষান্তরে আব্দুর রহমান তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি ইংরেজদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে রাজী হইলেন।

লর্ড ডাফ্‌রিন (১৮৮৪-৮৮ খ্রীঃ): রিপনের পর বড়লাট হইয়া আসেন লর্ড ডাফ্‌রিন। তাঁহার সময়ে রাশিয়া আফগানিস্তানের সীমানা সংলগ্ন দুইটি স্থান পর পর দখল করে। ইহা লইয়া রাশিয়ার সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি হইলেও লর্ড ডাফ্‌রিন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে এক মীমাংসা হইল। ইহার ফলে ইঙ্গ-রুশ তিক্ততা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-আফগান মৈত্রী দৃঢ়তর হইল। তাঁহার শাসনকালে **তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ** ঘটে। ইতিপূর্বে পেগু ইংরেজদের দখলে আসিয়াছিল। ইংরেজরা ব্রহ্মের অন্যান্য অংশে বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা চাহিতেছিল। কিন্তু ব্রহ্মের রাজা তাহাতে রাজী ছিলেন না। ইহাতে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশের বাকি অংশ গ্রাস করিতে চেষ্টা করিল। ব্রহ্মরাজ থিবো ফ্রান্সের সাহায্য লইয়া

ইংরেজদের প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের সঙ্গে একটি চুক্তি করিলেন। ইহাতে ইংরেজরা থিবোর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। এই সময়ে থিবো একটি ব্রিটিশ কোম্পানীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ইংরেজরা এই দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে এবং ব্রহ্মদেশের রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ দূত গ্রহণের জন্য দাবি জানাইল। এইসঙ্গে তাহারা ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ দাবি করিল। থিবো এই সব দাবি অগ্রাহ্য করিলে লর্ড ডাফ্‌রিন ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হইলেন এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪ খ্রীঃ) ঃ পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউন গিলগিট ও চিত্রলে ব্রিটিশ দূত প্রেরণ করেন। ইহা ভিন্ন বোলান গিরিপথ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ করেন। ইহাতে আফগানিস্তানের আমীর আব্দুর রহমান শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করিবার জন্য ভারত-আফগানিস্তানের সীমানা নির্ধারণের ব্যবস্থা হয় এবং মর্টিমার ডুরাণ্ডকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার নির্ধারিত সীমারেখা ডুরাণ্ড লাইন নামে পরিচিত হয়। ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি দিল যে এই লাইনের অপর দিকে কোন হস্তক্ষেপ করিবে না এবং সেইমত কয়েকটি স্থানও আফ্‌গানিস্তানকে ফিরাইয়া দিল। পক্ষান্তরে আফ্‌গানিস্তানও বিজাপুর, সোওয়াট ও চিত্রলের উপর অধিকার ছাড়িয়া দিল। এইভাবে ইঙ্গ-আফগান মিত্রতা স্থাপিত হইল। মণিপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ল্যান্সডাউন হস্তক্ষেপ করেন। এক ইংরেজ বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করিয়া মণিপুরের সেনাপতিকে হত্যা করিল এবং মণিপুরের নাবালক রাজপুত্রকে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে সিংহাসনে স্থাপন করিল। কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ পাইয়া ল্যান্সডাউন সেই রাজ্যের শাসনভার এক প্রতিনিধি সভার হস্তে অর্পণ করিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে রাজাকেই সেই রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। কালাতের খাঁ বা রাজাকে কতকগুলি অভিযোগে সিংহাসন হইতে সরাইয়া ল্যান্সডাউন তাঁহারই এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

লর্ড এলগিন (১৮৯৪-৯৯ খ্রীঃ) ঃ লর্ড এলগিন ছিলেন উদারনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি এদেশে আসিয়াই সীমান্ত সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হন। একদিকে ব্রহ্মদেশ ও অপরদিকে চীন ও শ্যামদেশের সঙ্গে এই সময় সীমান্ত নির্ধারিত হয়। রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রায় এক বৎসর ধরিয়া লর্ড এল্‌গিনকে যুদ্ধ চালাইতে হয় এবং উপজাতিগুলিকে তিনি কিছুটা দমন করিতে সক্ষম হন।

লর্ড এলগিন অর্থনীতির দিক হইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক সংকট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কতকগুলি প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটাইয়া সামরিক ও শাসনব্যবস্থাকে সুগঠিত করেন।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ): ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও স্বৈরাচারী। শাসনকার্যে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের অধিকাংশ সময় তিনি বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জনের বৈদেশিক নীতিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি, (২) আফগান নীতি, (৩) পারস্য নীতি এবং (৪) তিব্বত নীতি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লর্ড কার্জন "অগ্রসর নীতি" ত্যাগ করিয়া শান্তি নীতি অনুসরণ করিলেন এবং এই সীমান্তকে সংহত ও সুদৃঢ় করিতে চাহিলেন। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রল রাজ্যটি ইংরেজ অধিকারভুক্ত করা হইল এবং সীমান্তে কয়েকটি সেনানিবাস স্থাপিত হইল। পাঞ্জাব ও সীমান্তের কয়েকটি জেলা লইয়া উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হইল।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আফগান আমীর আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হাবিব-উল্লাহকে স্বাধীন আফগান নৃপতি বলিয়া মানিয়া কার্জন আফগানিস্তানের সম্পর্কে মৈত্রী নীতি অনুসরণ করেন। মধ্য-এশিয়ায় ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য এবং সমগ্র পারস্যে রুশ প্রভাব বন্ধের জন্য কার্জন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ কন্সালেট ও কয়েকটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিব্বতে রুশ প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ধারণা হইল। সেইজন্য ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল ইয়ং হাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্যকে তিব্বতে প্রেরণ করা হইল। কয়েকটি যুদ্ধের পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীয়গণ সন্ধি করিল। ইহার ফলে ব্রিটিশ বণিকগণ তিব্বতে বাণিজ্যের অধিকার পাইল। ভারত সরকার প্রচুর ক্ষতিপূরণ পাইলেন এবং লাসায় একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখার ব্যবস্থা হইল।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay Type Questions):

1. লর্ড লিটনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি লইয়া আলোচনা কর।
2. লর্ড ডাফরিনের আমলে আফগানিস্তান ও ব্রহ্মের সহিত বৃটিশ ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

3. লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালের গুরুত্ব আলোচনা কর।
4. শাসক হিসাবে লর্ড কার্জনের সাফল্যের আলোচনা কর।
5. ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনা কর।
6. ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) ঃ

(1) ডুয়ার্স অঞ্চল কি ভাবে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল ? (2) লর্ড রিপনকে ভারতবন্ধু বলা হয় কেন ? (3) রিপন আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্য কি করিয়াছিলেন ? (4) লর্ড ডাফ্রিনের শাসনকালে রাশিয়ার সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জান ? (5) মণিপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার সমস্যা ল্যান্সডাউন কি ভাবে সমাধান করেন ? (6) লর্ড এলগিনের উদারনীতির পরিচয় দাও। (7) পারস্য ও তিব্বতে রুশ প্রভাব বন্ধের জন্য কার্জন কি ব্যবস্থা করেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) ঃ

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

বাৎসরিক কর দিবার শর্তে ইংরেজগণ—রাজার নিকট হইতে ডুয়ার্স অঞ্চল অধিকার করেন। — —শাসনকালে বরোদার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রহস্যজনকভাবে— পতিত হন। লর্ড লিটনের অভ্যন্তরীণ নীতির ফলে ভারতীয়দের—বৃদ্ধি পাইল। লর্ড লিটনের শাসনকালে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে— —উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইংরেজ কর্মচারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও — ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। লর্ড ডাফ্রিনের শাসনকালে — আফগানিস্তানের সীমানা সংলগ্ন দুইটি স্থান — করে। লর্ড ল্যান্সডাউন বোলান গিরিপথ পর্যন্ত একটি — নির্মাণ করেন।

2. সঠিক উত্তরে (√) দাগ দাও :

(ক) ভারতে প্রথম লোকগণনা করা হয়
লর্ড লিটনের সময় ☐ লর্ড মেয়োর সময় ☐ লর্ড এলগিনের সময় ☐

(খ) দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন পাশ করেন
লর্ড নর্থব্রুক ☐ লর্ড লিটন ☐ লর্ড রিপন ☐

(গ) সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন
লর্ড ডাফরিন ☐ লর্ড লিটন ☐ লর্ড ল্যান্সডাউন ☐

(ঘ) ভারত ও আফগানিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করেন
লর্ড এলগিন ☐ মর্টিমার ডুরাণ্ড ☐ ল্যান্সডাউন ☐

(ঙ) ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের তিব্বত অভিযানের নেতৃত্ব করেন
লর্ড কার্জন ☐ কর্নেল ইয়ং হাজব্যাণ্ড ☐ মর্টিমার ডুরাণ্ড ☐

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার

ইংরেজরা এদেশে আসিয়াছিল বাণিজ্য করিতে। কিন্তু শীঘ্র বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল। বাণিজ্য করিতে আসিয়া একদল ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল।

তাহারা বুঝিয়াছিল যে এই অনগ্রসর দেশে সাম্রাজ্য বজায় রাখিতে হইলে দেশের অধিবাসীদের মনে ইংরেজ-প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে। ইংরেজরা যখন এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিল তখন এদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি কোনটাই উল্লেখযোগ্য ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষ কতকগুলি স্থানীয় রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না, কোন ঐক্য ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতার প্রভাব পড়িয়াছিল ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর। ফলে ভারতের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দেশের শাসন-ব্যবস্থা ছিল পঙ্গু, নানারূপ কুসংস্কার ও দুর্নীতিতে পূর্ণ।

ভারতীয়দের তুলনায় ইংরেজরা শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল। এই দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহারা অনুভব করিল যে এখানে তাহাদের প্রভাব স্থায়ী ও দৃঢ়তর করিতে হইলে এদেশবাসীর মনে ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও মোহ সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য চাই অবস্থার পরিবর্তন। অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে দেশে বিভিন্ন সংস্কার আনা প্রয়োজন।

ভারতে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতেই ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে নানাবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সামাজিক, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধিত হয়। বিভিন্ন ইংরেজ গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে যাঁহারা বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড ডালহৌসী ও লর্ড রিপনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন তখন ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ত্রুটি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। হেস্টিংস দেখিলেন যে রাজকোষ একেবারে শূন্য এবং অর্থাভাবে শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ি-

বার উপক্রম হইয়াছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস এই ব্যবস্থা রদ করেন এবং দেওয়ানী শাসনের ভার সরাসরি কোম্পানীর হাতে লইয়া আসেন। রাজস্ব আদায়ের ভার "কালেক্টর" (Collector) নামধারী এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর অর্পণ করেন। রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহা আদায়ের জন্য হেস্টিংস ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) গঠন করেন। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল জমিদারদের সঙ্গে রাজস্বের বন্দোবস্ত করা। কলিকাতা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে লইয়া একটি "রেভিনিউ" বোর্ড গঠন করা হইল।

এই বোর্ডের উপর রাজস্বনীতি নির্ধারণ এবং রাজস্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হইল। সেই সময় বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এজন্য প্রথমদিকে রাজস্ব ব্যবস্থা কতকটা পরীক্ষামূলক ভাবেই চালু করা হইল। যাহারা সর্বোচ্চ রাজস্ব দিবার প্রতিশ্রুতি দিত ভ্রাম্যমাণ কমিটি তাহাদিগকে জমির বন্দোবস্ত দিতেন। অল্পকালের মধ্যেই ইহার কুফল দেখা দিল। অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন জমিদাররা জমিদারী হারাইতে লাগিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের দিকে কোন লক্ষ্য না রাখিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করা হইতে লাগিল। হেস্টিংস তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ছয়টি 'প্রাদেশিক কাউন্সিলে' ভাগ করিয়া সেগুলির উপর রাজস্ব ব্যবস্থার দায়িত্ব দিলেন। প্রত্যেকটি কাউন্সিলকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য একজন করিয়া দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল। কালেক্টর পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস একটি রাজস্ব তদন্ত কমিশন গঠন করিলেন এবং তাহার সুপারিশ অনুসারে রাজস্বনীতির কিছু পরিবর্তন করিলেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া পুনরায় কালেক্টর নিয়োগ করা হইল। হেস্টিংস দেওয়ানী অর্থভাণ্ডার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সমস্ত রাজস্ব সংস্কারই পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হইয়াছিল।

জমিদারদের সহিত নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা হইল। পরবর্তিকালে পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে এক বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এই ব্যবস্থা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

বিচার সংক্রান্ত সংস্কার : দেওয়ানী লাভের আনুষঙ্গিক দায়িত্ব হিসাবে দেওয়ানী বিচারের দায়িত্বও কোম্পানীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থাও কোম্পানীর হাতে আনিতে চাহিলেন। প্রথমে তিনি শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে পৃথক করেন। প্রত্যেক জেলায় যথাক্রমে কালেক্টর ও কাজীর অধীনে মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত

ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হইল। কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি পৃথক বিচারালয় স্থাপিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতে বিচারকার্য গভর্নর ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হইল। সদর নিজামতের বিচারালয়ের ভার রহিল নবাবের উপর। হেস্টিংস বিচারে অত্যধিক জরিমানা করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। মামলা-মকদ্দমার কাগজপত্র সংরক্ষণ, সুদের হার হ্রাস, বার বৎসর পর মামলা মকদ্দমা করিবার অধিকার তামাদি হওয়া, হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দুশাস্ত্র এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে কোরান ও হাদিসের বিধি অনুসারে বিচার করা প্রভৃতি প্রশংসনীয় সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

হেস্টিংস 'দস্তক' বা ছাড় প্রথা বিলুপ্ত করিয়া অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। কোম্পানীর ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইংরেজদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সম্রাট শাহ আলম মারাঠাদের আশ্রয় লইয়াছেন এই অজুহাতে সম্রাটের বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তিনি বাংলার নবাবের বাৎসরিক বৃত্তিও অর্ধেক করিয়া দেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার ও ব্যয় সংকোচ করিয়া হেস্টিংস কোম্পানীর আর্থিক সচ্ছলতা কিছু পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন।

হেস্টিংস-এর শাসনকালে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে **রেগুলেটিং অ্যাক্ট** নামে একটি আইন পাশ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বাংলার গভর্নরকে কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যের গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। ঐ আইন অনুসারে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন অপরাপর বিচারপতি লইয়া কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থাপিত হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। হল্‌হেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ, উইলকিন্‌স্ সাহেব কর্তৃক গীতার ইংরেজী অনুবাদ পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহেই সম্ভব হইয়াছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। তাঁহাকে "উপযুক্ত অভিজাত" শাসক রূপে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান ভারতের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি কর্নওয়ালিসই রচনা করিয়াছিলেন।

কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে কর্নওয়ালিস পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং ভবিষ্যতে কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, উৎকোচ গ্রহণ ও পুরস্কার গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্যপদ্ধতির জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য স্থাপন করা হয়। তিনি কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক চরিত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাকে ৩৫টি জেলার পরিবর্তে ২৩টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক জেলায় উচ্চপদস্থ দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়—জজ্ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর।

পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় পুলিসবাহিনী পোষণ করিতেন। অতঃপর এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করা হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শাসনব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—সাধারণ প্রশাসন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ।

বিচার বিভাগে তিনি কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। বাংলার নবাবের ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া তাহা গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হইল। চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করা হইল এবং প্রত্যেকটিতে দুইজন করিয়া ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত করা হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের পর দেওয়ানী সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে পৃথক করা হইল। জেলা আদালতগুলির উপর চারিটি প্রাদেশিক আপীল আদালত স্থাপন করা হইল। বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় স্থাপিত হইল।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** (Permanent Settlement)। হেস্টিংস-এর সময় জমিদারদের সহিত প্রথমে পাঁচ বৎসর ও পরে এক বৎসরের জন্য জমিদারী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কৃষককুল ও কোম্পানী উভয়-পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিদারী লাভ করার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারগণ প্রজাদের নিপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করিতেন। আবার অনেক সময় জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানীর নিকট চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব প্রদান করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইতেন। ফলে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হইত। এই সব অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ কর্নওয়ালিসকে রাজস্ব সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ

দেন। ইংলণ্ডে প্রচলিত জমিদারী প্রথা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বিবেচনা করিয়া কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের সহিত জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করেন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের লাভ হইল। তাঁহারা জমির মালিকরূপে গণ্য হইলেন এবং সরকারকে তাঁহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইল। অস্থায়ী ও অত্যাচারমূলক খাজনা প্রদানের দায়িত্ব হইতে প্রজারা রক্ষা পাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার ফলে প্রজাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। জমির উপর স্বত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকায় বহু ক্ষেত্রে জমিদারগণ প্রজাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজভক্ত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। জমিদারদের দেয় রাজস্ব চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় সরকারের আয়ের পথ রুদ্ধ হইল। জমিতেই অধিক মূলধন নিয়োগ করার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজদের হাতে চলিয়া গেল এবং অধিকাংশ বাঙ্গালী কৃষিজীবীতে পরিণত হইল।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর সংস্কার

লর্ড বেন্টিঙ্কই ভারতের প্রথম ইংরেজ শাসক যিনি জনকল্যাণমূলক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সংস্কার কার্যাদি প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—অর্থ নৈতিক, শাসন সংক্রান্ত, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত।

কোম্পানীর আর্থিক সচ্ছলতার জন্য বেন্টিঙ্ক সৈন্যবাহিনীর 'অর্ধ-ভাতা' বন্ধ করেন এবং সামরিক কর্মচারীদের বেতনের হার হ্রাস করেন। ইহার পর তিনি মালবে আফিং-এর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য করেন। মাদ্রাজে "রাওতওয়ারী" প্রথার প্রবর্তন করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হয়। এইসব সংস্কারের ফলে কোম্পানীর বাৎসরিক ঘাটতি উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। বেন্টিঙ্ক বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার আইন অনুযায়ী গুণের বিচারে ভারতীয়গণকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়গুলি ও প্রাদেশিক আপীল আদালতগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশনার নামে এক উচ্চতর নূতন পদের সৃষ্টি করা হয়। বিচারালয়গুলিতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষার প্রবর্তন করা হয়।

সামাজিক সংস্কারের জন্যই বেন্টিঙ্ক ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। এগুলির মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি সাধন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই প্রথা অনুসারে প্রতি বৎসর হাজার হাজার হিন্দু বিধবাকে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়া সহমৃতা হইতে হইত। এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলুপ্তির জন্য পূর্বে কোন কোন গভর্নর জেনারেল কিছুটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু বেন্টিঙ্ক এই ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ উদারপন্থীদের সহযোগিতায় ও আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এইভাবে এক অতি প্রাচীন ও অমানুষিক প্রথার অবসান ঘটে। ১৮২৯ সালে ইহা আইনত দণ্ডনীয় হয়। ঠগী দমন বেন্টিঙ্কের অপর এক কৃতিত্ব। ঠগীদের অত্যাচার চরমে উঠিলে বেন্টিঙ্ক স্মিথ ও মেজর স্লিম্যানকে ইহা দমন করিবার জন্য নিয়োগ করেন। কিছুকালের মধ্যেই কঠোরভাবে ঠগীদের দমন করা হয়। ইহা ভিন্ন ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ধর্মের নামে নরবলি ও শিশু উৎসর্গ করিবার যে প্রথাগুলি বর্তমান ছিল, তাহাও বন্ধ করা হয়।

বেন্টিঙ্ক ভারতবাসীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করিতেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং প্রাচ্যভাষায় শিক্ষাদানের প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়াছিল। প্রিন্সেপ, উইলসন প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ইংরেজগণ প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষাদানে পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে পাশ্চাত্য ধারার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন মেকলে। মেকলে ছিলেন বেন্টিঙ্কের বন্ধু এবং আইন সচিব হিসাবে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে বহু যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে ভারতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন। প্রাচ্যবিদ্যা লইয়া মশগুল থাকিলে ভারত মধ্যযুগীয় আবহাওয়া হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। মেকলে অবশ্য রামমোহন রায় প্রভৃতির মত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। যাহা হউক অবশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বেন্টিঙ্ক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের কথা ঘোষণা করেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই ব্যবস্থার ফলে নব-ভারত সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়, ভারতের জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে এবং পাশ্চাত্য জগতের সহিত মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বেন্টিঙ্কের উৎসাহে ও পরোক্ষ চেষ্টায় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ে এলফিন্‌স্টোন কলেজ স্থাপিত হয়।

রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা এবং জীবনব্যাপী সমাজ হিতৈষণামূলক কার্য তাঁহাকে ভারতের নবযুগের প্রবর্ত্তকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে এবং ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানকল্পে তিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারা পাশাপাশি চলিতেছিল। এই উভয় ধারার সমন্বয় সাধনে তাঁহার দান ছিল অসামান্য। সমাজ সংস্কারকরূপে তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক এই প্রথা বিলোপের জন্য ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন জারী করেন। নারী জাতির উন্নতির জন্য রাজা রামমোহন রায় বাল্যবিবাহ রহিত, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি দাবি জানাইয়াছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ভাবের উন্মেষ রামমোহনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার এবং স্বাধীনতার দাবি জানাইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে "হাউস অফ কমনস্"-এর সম্মুখে জাতীয় দাবি লইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনার দাবি করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং উপনিষদের ধর্ম যে অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ তাহা প্রমাণ করেন। তাঁহার ধর্মমত অনুসরণকারীদের লইয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অসামান্য। তিনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিস্টলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।



রামমোহন রায়

লর্ড ডালহৌসীর সংস্কার

ডালহৌসী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক নীতির জন্য ভারতের ইতিহাসে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কার কার্যাদির ব্যাপারে তাঁহার সংগঠন ক্ষমতার প্রশংসাও করিতে হয়।

যানবাহনের সুবিধার জন্য ডালহৌসী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার এবং কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করেন। তাঁহার আমলেই প্রথম রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং "ইস্ট ইণ্ডিয়ান", "সাউথ ইণ্ডিয়ান" নামে কয়েকটি রেল কোম্পানী স্থাপিত হয়। তিনি প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ স্থাপন করেন।

ডালহৌসী এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণের অপরাধে কাহাকেও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ভারতীয়দের সমর্থন লাভ করিয়া হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করেন। ডালহৌসী চার্লস উডের শিক্ষা-সংক্রান্ত সুপারিশ কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি এক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করেন। বর্তমান ভারতে প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার ভিত্তি ডালহৌসীই রচনা করিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসীর সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর দ্বারা শাসিত হইবার ব্যবস্থা হয়। ডালহৌসীর সময়ে রানীগঞ্জের কয়লাখনি ও গিরিডির অভ্রখনির কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী যে গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly) গঠিত হয়, লর্ড ডালহৌসী উহাতে ভারতীয়দের গ্রহণের সুপারিশ করিয়া ব্যর্থ হন। তাঁহার সুপারিশেই ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দায়িত্ব বিভক্ত করা হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বর্ণমোহর প্রচলিত ছিল। ডালহৌসীর সময়ে এই মুদ্রানীতি পরিত্যক্ত হয়। জনহিতকর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য পূর্তবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারাগার পরিদর্শন, পথনির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী খনন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব এই বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহার আমলে দুই পয়সার মাশুলে ভারতের সর্বত্র চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে তাঁহার সময়ে বিভিন্ন উপায়ে আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে নবযুগের সূচনা হয়। কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি রুর্‌কীতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন। রাজকর্মচারীদের জন্য তিনি বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ডালহৌসীর উৎসাহে এবং মহামতি বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডালহৌসীর সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মে প্রগতিশীল ভারতীয়রা কিছুটা সমর্থন জানাইলেও প্রাচীনপন্থীরা সংস্কারগুলি সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শাসনের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়দের মনে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ

জমিতেছিল তাঁহার কার্যাবলীর ফলে তাহা ব্যাপক আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া মহাবিদ্রোহের পটভূমিকা রচনা করে।

লর্ড রিপনের সংস্কার

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালের ন্যায় লর্ড রিপনের শাসনকালও (১৮৮০-৮৪) ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি রিপনের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। রিপন প্রথমেই অর্থনৈতিক সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে আমদানী শুল্কের হার ও লবণ-কর হ্রাস করা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন করিয়া রিপন ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁহার উদ্দেশ্য হইল শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থানীয় জন-সাধারণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহার দ্বারা শহরের পৌর সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার তিনি জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড নামক প্রতিনিধি সভার হস্তে ন্যস্ত করেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন।



লর্ড রিপন

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার রদ করেন। রিপন পুনরায় এই স্বাধীন অধিকার প্রদান করেন। ভারতের শিক্ষায়তনগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিয়া ভারতীয়দের হস্তে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করাই রিপনের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করার জন্য, কলেজগুলিকে সরকারী সাহায্য দানের জন্য এবং প্রাথমিক

ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য **হান্টার কমিশন** যে সুপারিশ করেন, রিপন তাহা কার্যে পরিণত করেন।

রিপন কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রজাস্বত্ব আইন এবং কারখানার শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কারখানা আইন পাশ করেন। রিপনের উদারনৈতিক সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল **'ইলবার্ট বিল'** নামে এক আইনের পরিকল্পনা। বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে এযাবং যে বৈষম্যমূলক রীতি প্রচলিত ছিল তাহার অবসান করাই এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল। প্রয়োজনীয় আইনের খসড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্যার ইলবার্টের উপর। ইলবার্টের খসড়ায় ভারতীয় বিচারকগণকে ইউরোপীয় বিচারকদের ন্যায় সমমর্যাদা ও সমক্ষমতা দানের প্রস্তাব করা হয়। ভাইসরয়ের কাউন্সিল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি আইনের খসড়া অনুমোদন করেন। কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া চা বাগানের মালিকগণ এবং ইউরোপীয় কর্মচারিগণ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। শেতাঙ্গ নীলকররা প্রকাশ্যে রিপনকে অপমানিত করে। তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া রিপন খসড়ার কিছু পরিবর্তন করেন। স্থির হইয়াছিল যে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিবেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ইউরোপীয়গণ জুরীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং জুরীদের অর্ধেক ইউরোপীয় হইবেন।

ইলবার্ট বিল সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই থমসন ও গ্যারেটের উক্তি প্রণিধান করা প্রয়োজন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, "কোন শিক্ষিত ভারতীয় ইলবার্ট বিলের শিক্ষা কখনও ভুলিয়া যায় নাই।"

ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারতীয়দের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাই উপলব্ধি করেন যে একমাত্র সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই ইংরেজ সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করা যায়।

প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য লর্ড রিপন আইন প্রণয়নের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য এবং শিশু শ্রমিকদের যাহাতে অধিক সময় কাজ করান না হয় সেইজন্য কারখানা আইন পাশ করিয়া রিপন শ্রমিকদের কাজের সময় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জনের সংস্কার

লর্ড কার্জন স্বৈরাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবেই ভারতবাসীর নিকট পরিচিত। তাঁহার বাংলা বিভাগ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে

তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কার্জন কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

জমির খাজনা নির্ধারণে জমির গুণাগুণ, কৃষকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিবার নীতি তিনি প্রচলন করেন। সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া তিনি কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন পাশ করিয়া তিনি কৃষি জমির খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হওয়াকে রোধ করার চেষ্টা করেন এবং ভূমি হস্তান্তরে কতকগুলি বাধা নিষেধ আরোপ করেন।



লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে "বিশ্ববিদ্যালয় আইন" পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির এবং কলেজ অনুমোদনের অধিকার সরকারের হাতে নিবার ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা হিসাবে কাজ না করিয়া উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক চিহ্নাদি সংরক্ষণ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন, সরকারী বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ স্থাপন, লবণকর হ্রাস প্রভৃতি সংস্কার কার্যও তিনি করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার হইল বাংলা দেশকে ভাগ করিয়া 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসাম' নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন। বাঙ্গালী জাতিকে শাসনের সুবিধার অজুহাতে রাজনৈতিক দিক দিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার এবং তাহাদের জাতীয়তাবোধ ও ঐক্য নাশ করিবার এই চেষ্টা বাঙ্গালী জাতি মানিয়া লয় নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সংস্কারের ফলাফল

ইংরেজদের শাসন সর্বপ্রথম বাংলায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রগতিমূলক সংস্কারসমূহ প্রবর্তিত হইল। এই আদর্শ ক্রমে সমগ্র ভারতে নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত করিল। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাঙ্গালী মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিল এবং পরে ইহা সমস্ত ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলার সাহিত্যে প্রতিফলিত হইল। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলায় সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের এক নূতন আদর্শের জন্ম হইল।

ইহাতে বাংলায় সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাজনীতির ধারণা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইল। এক কথায় ভারতে মধ্যযুগের অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূচনা হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতবাসীর পরিচয় ঘটিল। ইহার ফলে ভারতের ধর্ম, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল।

এই সময়েই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষার বিকাশ ঘটিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত গদ্য-সাহিত্য ছিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইলে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবই ছিল ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষের প্রধান কারণ। মেকলে এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া উঠিলে পাশ্চাত্যের শাসন পদ্ধতি দাবি করিবে। মেকলের এই মন্তব্যের যথার্থতা অচিরেই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইউরোপের জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও উহার প্রসার সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতবাসী জ্ঞানলাভ করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে উদারনীতিবাদের চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল। মিলটন, মিল, বেন্থাম প্রমুখ মনীষীদের রচনা শিক্ষিত ভারতবাসীকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিল। এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী ক্রমশঃ রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং স্বায়ত্তশাসনলাভে প্রয়াসী হইয়া উঠিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) :

1. সঠিক উত্তর (√) দাগ দিয়া বুঝাইয়া দাও :

(ক) 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন
- লর্ড বেন্টিঙ্ক ☐
- লর্ড ওয়েলেস্‌লী ☐
- লর্ড ক্লাইভ ☐
- লর্ড কর্নওয়ালিস ☐

(খ) বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন
- ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ☐
- ১৭২৯ ,, ☐
- ১৮২৯ ,, ☐
- ১৭৯২ ,, ☐

(গ) কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন
- লর্ড কর্নওয়ালিস্ ☐
- লর্ড বেন্টিঙ্ক ☐
- লর্ড ডালহৌসী ☐
- স্যার লরেন্স ☐

(ঘ) 'ইলবার্ট বিল'-এ ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের
- অধীন করা হইয়াছিল ☐
- সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছিল ☐
- অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন করা হইয়াছিল ☐

(ঙ) লর্ড কার্জন, 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' দ্বারা কলেজগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ
- হ্রাস করেন ☐
- বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন ☐
- উঠাইয়া দেন ☐

2. শূন্যস্থান পূরণ কর :

লর্ড বেন্টিঙ্ক স্লিম্যানের সাহায্যে — দমন করিয়া পথ চলার বিপদ দূর করেন। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন — —। বৃটিশ ভারতের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন লর্ড —। হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে — শাসনভার কোম্পানীর — লইয়া আসেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে — আইন অনুযায়ী গুণের বিচারে ভারতীয়দের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের প্রবর্তন করেন লর্ড —। ডালহৌসীর সময়ে মহামতি — ও — সাহেবের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন — সাহেব।

সংক্ষিপ্ত রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) :

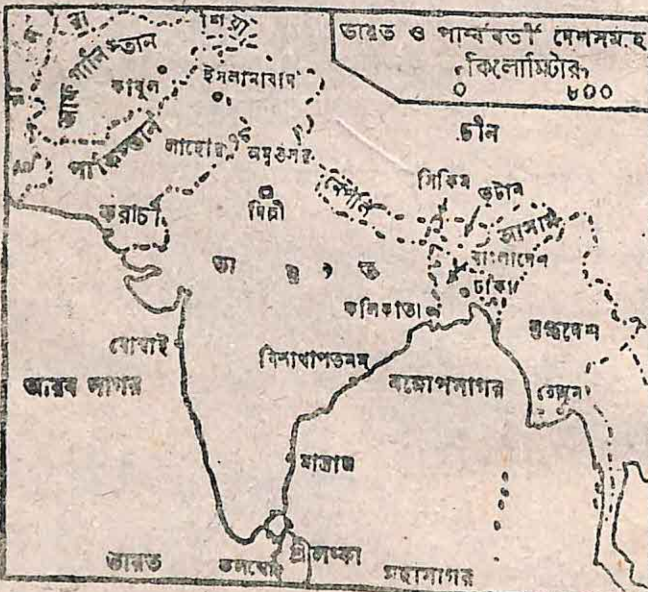
1. ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্বনীতির সংস্কার সম্বন্ধে কি জান ?
2. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণ আলোচনা কর।
3. লর্ড কর্নওয়ালিস্ বিচার ব্যবস্থায় কি সংস্কার করিয়াছিলেন ?
4. শিক্ষার উন্নতির জন্য বেন্টিঙ্ক কি করিয়াছিলেন ?
5. লর্ড রিপন ভারতের শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করিবার জন্য কি ব্যবস্থা লইয়াছিলেন ?
6. লর্ড ডালহৌসীর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কি জান ?

রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay Type Questions) :

1. ওয়ারেন হেস্টিংসের বিভিন্ন সংস্কার লইয়া আলোচনা কর।
2. লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে কি কি সংস্কার সাধিত হইয়াছিল ?
3. লর্ড বেন্টিঙ্কের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর পরিচয় দাও।
4. সংস্কারক হিসাবে লর্ড ডালহৌসীর পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।
5. লর্ড রিপনকে উদারপন্থী ও ভারতহিতৈষী শাসক বলা হয় কেন ?
6. লর্ড কার্জনের সংস্কারগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভারত ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

ভারত ও আফগানিস্তান : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে। ঠিক এই সময়েই রাশিয়া পূর্ব সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রাশিয়ার পারস্য অভিমুখে অগ্রসর নীতি ইংলণ্ডস্থ ব্রিটিশ সরকারের দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপরও এই ভীতি প্রতিফলিত হয়। রাশিয়ার সাহায্য লইয়া পারস্য আফ্‌গানিস্তানের হিরাট দখল করিলে ভারতে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তিনি আফগানিস্তানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া রুশ আক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত্‌ মহম্মদও ইংরেজদের সহিত মিত্রতার জন্য উৎসুক



ছিলেন। কিন্তু তিনি মিত্রতার শর্ত হিসাবে রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশোয়ার ইংরেজদের মাধ্যমে ফেরত চাহিলেন। ইংরেজরা রঞ্জিৎ সিংহের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ ছিল। এই মিত্রতা তাহারা নষ্ট করিতে চাহিল না। সুতরাং দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপনে রাজী হইলেন না। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে আমীর পদ হইতে সরাইয়া ইংরেজদের প্রতি

সহানুভূতিসম্পন্ন শাহ্ সুজাকে আমীর পদে স্থাপন করিতে চাহিলেন। শাহ্ সুজা ছিলেন আহম্মদ শাহ দুররানীর বংশধর। অকল্যাণ্ড শাহ্ সুজা ও রঞ্জিৎ সিংহের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই সময় আফ্গানিস্তানে অন্তর্বিরোধ দেখা দিলে লর্ড অক্ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দোস্ত মহম্মদ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং বন্দী অবস্থায় কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসানো হইল। শাহ্ সুজা ইংরেজদের ক্রীড়নকের ভূমিকা লওয়ায় আফগানদের বিরাগভাজন হইলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁয়ের নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহ করিল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইয়া কাবুল ত্যাগ করিল। প্রত্যাবর্তনের পথে সৈন্যরা তুষারপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আফগানদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

অকল্যাণ্ডের নীতির এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিলেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা কাবুল ও কান্দাহার ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন বটে কিন্তু তাহার পূর্বে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সময় শাহ্ সুজা নিহত হইলে এবং গজনী হস্তচ্যুত হইলে ব্রিটিশ সৈন্যদের আফগানিস্তান ত্যাগের আদেশ দেওয়া হইল। দোস্ত মহম্মদ কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মৈত্রীর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই



দোস্ত মহম্মদ

সময় রাশিয়া হিরাট আক্রমণ করিলে দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সাহায্য লইয়া এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। মিত্রতার চুক্তির ফলে আফগানিস্তান পারস্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা লাভ করিল। অপরদিকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা আফগানদের নিকট হইতে কোন সাহায্য না পাওয়ায় ঐ বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সুবিধা হইয়াছিল।

দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ দেখা দিলে ভারতের গভর্নর-জেনারেল অনুরুদ্ধ হইয়াও কোন হস্তক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু রাশিয়ার অগ্রগতিতে শঙ্কিত হইয়া স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯ খ্রীঃ) এবং পরে লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২ খ্রীঃ) তৎকালীন কাবুলের

অধিপতি আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র শের আলিকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শের আলি বিলাতের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। তখন বাধ্য হইয়া শের আলি রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শাসন কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন হওয়ায় তাঁহাদের নীতিও পরিবর্তিত হইল। রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বড়লাট লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) কালাতের খাঁয়ের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোয়েটা দখল করিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শের আলি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং ইংরেজ দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ শুরু হইল। ইতিমধ্যে ইউরোপে সম্পাদিত বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) ফলে রাশিয়ার পক্ষে আফগানদের সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হইল না। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়া কান্দাহার অধিকার করিল। শের আলি রাশিয়ায় পলাইয়া গেলেন এবং অল্পকাল পরে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ গণ্ডো-মুকের সন্ধি দ্বারা তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি ব্রিটিশ উপদেশ অনুসারে পরিচালিত করিতে ও কাবুলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সন্ধির বলে কুরম, পিসিন, সিবি প্রভৃতি গিরিসঙ্কটগুলি ব্রিটিশ অধিকারে আসিল। সন্ধির শর্তানুসারে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত কাবুলে নিহত হইলে ইংরেজ সৈন্যরা কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিল। বড়লাট লিটন শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহমানকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় বিলাতে উদারনৈতিক গ্লাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হইলে আফগান-নীতি পরিবর্তিত হইল। লর্ড রিপন গভর্নর জেনারেল হিসাবে এদেশে আসার কিছু দিনের মধ্যেই (১৮৮০ খ্রীঃ) কান্দাহারের ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনী শের আলির পুত্র আয়ুব খাঁয়ের নিকট মাইবা নামক স্থানে পরাজিত হইল। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি রবার্টস কাবুল হইতে কান্দাহারে আসিয়া আয়ুব খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। তিনি এই যুদ্ধে আব্দুর রহমানের যথেষ্ট সাহায্য পাইলেন।

লর্ড রিপন আব্দুর রহমানকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। আব্দুর রহমান আফগান পররাষ্ট্র নীতি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। গণ্ডোমুকের সন্ধি দ্বারা লব্ধ স্থানগুলি ব্রিটিশ অধিকারে রহিল। এইভাবে রিপনের আমলে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। লর্ড ডাফ্রিনের আমলে এবং পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ল্যান্সডাউনের আমলে এই মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রহিল। ল্যান্সডাউনের আমলে আফগানিস্তান ও ভারতে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা ডুরাণ্ড লাইন দ্বারা দুইপক্ষের সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়। লর্ড কার্জনের সময়ে সাময়িকভাবে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু লর্ড কার্জন আফগানিস্তানের আমীর হবিবউল্লাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করিলে এই তিক্ততার অবসান ঘটে।

ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের মূল কারণ ছিল ইংরেজদের রুশ-ভীতি। রাশিয়া ও রাশিয়ার মিত্র পারস্যের বিরুদ্ধে ইংরেজরা আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী দেশ (Buffer State) হিসাবে রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। এজন্য তাহারা আফগানিস্তানের উপর নিজ প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় ও দুর্ধর্ষ আফগানরা স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া ইংরেজদের মিত্রতা গ্রহণে রাজী ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা কিছু অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ভারত-ভূটান সম্পর্ক : হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই রাজ্যটির সহিত ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম চেষ্টা হয় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ভূটানের সামরিক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোচবিহার অঞ্চলে হানা দিলে কোচবিহারের অধিপতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন জেমস-এর নেতৃত্বে একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। জেমস্-এর হাতে ভূটানীরা পরাজিত হইয়া কোচবিহার ছাড়িয়া নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের তেশিলামার মধ্যস্থতায় ইংরেজ ও ভূটানীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার পর কয়েক বৎসর ইংরেজ শাসিত অঞ্চলে কোনরূপ অশান্তি ঘটে নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংস ভূটান ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্নারের নেতৃত্বে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহারা কোনরূপ সাফল্য লাভ করে নাই।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আবার সীমান্তবর্তী ভূটানের সঙ্গে তিক্ততা দেখা দিতে লাগিল। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, কোম্পানী আসামের ডুয়ার্স অঞ্চল নিজের দখলে রাখিবে এবং ভূটানকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিবে। বিনিময়ে ভূটানীরা সীমান্ত অঞ্চলে হানা দিবে না। কিন্তু ইহার পরেও সীমান্তের অশান্তি দূরীভূত হইল না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন লরেন্সের শাসনকালে ভূটানীরা এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য প্রেরিত ইংরেজদের প্রতিনিধি অ্যাশ্লি ইডেনকে ধরিয়া লইয়া গেল। লরেন্স ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভূটানের রাজা ডুয়ার্স অঞ্চল ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন এবং বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে ভূটান ইংরেজদের করদ-মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল। পরবর্তীকালে ইংরেজরা ভূটানকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে।

ভারত-তিব্বত সম্পর্ক : ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় হইতে তিব্বতের সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক সুরু হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তিব্বত ও তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপালের সহিত বাণিজ্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়, কারণ তিব্বতীয়রা বিদেশীদের উপস্থিতি অপছন্দ করে। ইহার পর সিকিমের উপর ইংরেজদের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিব্বতের দিকে ইংরেজদের আবার দৃষ্টি পড়ে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীয়রা ইংরেজদের সংরক্ষিত সিকিম আক্রমণ করিলে ইংরেজ সৈন্য তাহাদের তাড়াইয়া দেয়। কয়েক বৎসর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে ইংরেজদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সিকিম ও তিব্বতের সীমা নির্ধারিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য কতক পরিমাণে চলিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

লর্ড কার্জনের সময় (১৮৯৯-১৯০৫) তিব্বতীয়রা একজন রুশ প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিল। ইহাকে কার্জন ভাল চোখে দেখিলেন না। তিব্বতীয়রা চীনের প্রাধান্য মুক্ত হইবার জন্য রুশদের মিত্রতা গ্রহণে উৎসুক হইল। দালাইলামা এই সময় তাঁহার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রুশ গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে প্রতিনিধি সভাকে পদচ্যুত করিয়া অভিজাত-শ্রেণীর হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিলেন এবং শাসন-ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। দালাইলামার গৃহশিক্ষক দরজিয়েফ (Dorjieff) একাধিকবার রাশিয়ায় দূত হিসাবে প্রেরিত হইলেন। কার্জন তিব্বতে একটি ইংরেজ মিশন প্রেরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের অনুমতি চাহিলেন। এই সময় রাশিয়ার সহিত তিব্বতের একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এই গুজব প্রচারিত হইল। কার্জন তিব্বতকে রুশ প্রভাব মুক্ত করিবার জন্য একদল সৈন্যসহ কর্নেল ইয়ং হ্যাসব্যাণ্ডকে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন (১৯০৩ খ্রীঃ)। তিব্বতীয়রা ইয়ং হ্যাসব্যাণ্ডকে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কোনরূপ আলাপ আলোচনা চালাইতে



দালাই-লামা

অস্বীকার করিল এবং ইংরেজদের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইয়ংহ্যাসব্যাণ্ড এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করিয়া লাসায় প্রবেশ করিলেন। তিনি তিব্বতীয়দের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন (১৯০৪ খ্রীঃ)। এই চুক্তি অনুসারে গিয়াংসি, গারটোম এবং যাতুং এই তিনটি অঞ্চলে ব্রিটিশদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল এবং একজন ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধিকে লাসায় গ্রহণ করা হইল। এই সঙ্গে তিব্বতীয়দের ৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইল। স্থির হইল প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টাকা হিসাবে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত না তাহা পরিশোধিত হইবে ততদিন চুম্বি উপত্যকা ব্রিটিশ বাহিনীর অধিকারে থাকিবে। এই সঙ্গে তিব্বতের পররাষ্ট্র নীতির উপর ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর জন্য ইংরেজদের অধিকারও স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ চুক্তিতে স্থির হইল যে, রাশিয়া বা ইংলণ্ড চীনের মাধ্যমে তিব্বতের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবে। ইহাতে তিব্বতের উপর চীনের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চীন তিব্বত আক্রমণ করিলে দালাইলামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর চীনে বিপ্লব দেখা দিল। চীনের মাঞ্চু বংশের পতন ঘটিলে দালাইলামা তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন (১৯১২ খ্রীঃ)। ইহার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের উত্তর সীমান্ত শান্তিপূর্ণ রাখিবার জন্য সিমলায় এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে তিব্বত, চীন ও ব্রিটিশ সরকার এক চুক্তি দ্বারা তিব্বতকে দুই অংশে ভাগ করিলেন। দুইভাগের উপরই চীনের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল। কিন্তু বহিঃতিব্বতে (Outer Tibet) অর্থাৎ ভারত-সীমার সংলগ্ন তিব্বতের অংশে দালাইলামার পূর্ণ শাসনাধিকার স্বীকৃত হইল। এই চুক্তি দ্বারা ভারত, ভূটান ও তিব্বতের সীমারেখা নির্ধারিত হইল। এই সীমারেখাই ম্যাকমোহন (Mac Mohon) লাইন বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর এবং চীনের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার ফলে তিব্বতের উপর এই দুই দেশের পক্ষ হইতে হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা দূরীভূত হইল। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের মিত্রতার সম্পর্কও বজায় রহিল। কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিপ্লবের পর জনগণতন্ত্রী চীন পূর্বের চুক্তি উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণভাবে তিব্বতকে নিজের দখলে লইয়া যায়।

ভারত-ব্রহ্মদেশ সম্পর্ক: সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ বণিকরা ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বিনা বাধায় বাণিজ্য করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত

এই সুযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ বোদোপায়া আরাকান অঞ্চল ও মণিপুর দখল করিয়া লইলে ব্রহ্মদেশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়িল। ইহাতে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইংরেজরা বার বার ব্রহ্মদেশে দূত পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। মধ্যযুগে আরাকানের রাজা ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাশিমবাজার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। বোদোপায়া এইসব অঞ্চলের উপর অধিকার দাবি করিলেন। ইংরেজরা ঐ দাবি অগ্রাহ্য করিল। ইহার পর বোদোপায়ার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার পুত্র পোগিদোয়া রাজা হইলেন। তিনি আসাম জয় করিলেন। ইহার পর চট্টগ্রামের নিকট শাহপুরী দ্বীপটি ব্রহ্মরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইলে ব্রিটিশ ভারত আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। লর্ড আমহার্স্ট আলাপ আলোচনার মারফত একটা মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ইহার পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইয়ান্দাবুর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। এই সন্ধির ফলে ব্রহ্মরাজ আহোম রাজ্য (আসাম), কাছাড়, জয়ন্তীয়া এবং মণিপুরের উপর সর্ববিধ কর্তৃত্বের দাবি ত্যাগ করিলেন এবং আরাকান ও তেনাসারিম ইংরেজদের প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কোম্পানীকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করিতে এবং রাজসভায় একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখিতে স্বীকৃত হইলেন।

কিছুকাল পরে ব্রহ্মদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিল। ইহার ফলে ইংরেজ রেসিডেন্ট ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হস্তে নিগৃহীত হইলে লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মদেশ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিবার জন্য কমাণ্ডার ল্যাম্বার্টকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইলেন। ল্যাম্বার্ট ব্রহ্মদেশের একটি জাহাজ দখল করিয়া বসিলে বর্মী সৈন্যরা ল্যাম্বার্টকে আক্রমণ করিল। ইহার ফলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে ব্রহ্মরাজ পেগু শহরটি ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিলেন (১৮৫২ খ্রীঃ)। চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্র উপকূল ইংরেজদের অধিকারে আসিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে বাণিজ্যের অধিকার চাহিলে, ব্রহ্মরাজ উহা দিতে অস্বীকার করিলেন। ইংরেজরা এই অঞ্চলটিও দখল করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ব্রহ্মরাজ থিবো ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। সেই সময় ফরাসীরা কোচিন-চীন ও টঙ্কিন প্রদেশ দখল করিয়া উত্তর ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্রহ্মদেশ সরকার

ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হইয়া তাহাদের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিল। এই সমস্ত কার্যকলাপ ইংরেজদের ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। ঠিক এই সময়ে থিবো সামান্য অপরাধে এক ইংরেজ বণিক কোম্পানীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন ব্রহ্ম-দেশের রাজধানী মান্দালয়ে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখিতে এবং ব্রিটিশ বণিক কোম্পানীর উপর অর্থ দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে আহ্বান জানাইলেন। এই সঙ্গে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনের সহিত বাণিজ্য চালাইবার সুযোগও দাবি করিলেন। এই সব দাবি মানিতে অস্বীকার করিলে ডাফ্রিন ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৮৫ খ্রীঃ)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণা দ্বারা গভর্নর জেনারেল সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ হিসাবে শাসিত হইতেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫ খ্রীঃ) ব্রহ্মদেশে জাপানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে (১৯৪৪ খ্রীঃ) জাপানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সে দেশে জনজাগরণ ঘটে। ফ্যাসিবিরোধী জনমুক্তি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আউন সান। ঐ কমিটির নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম সুরু হয়। ১৯৪৪ সালের শেষে এই কমিটি ব্যাপকতা লাভ করে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়িয়া উঠে। জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মিত্রশক্তির সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ঘটে। ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগতির ফলে মান্দালয়ের বর্মী সৈন্য শিবিরে বিদ্রোহের সুবিধা ঘটিল। ইহার পর ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্ম অধিকার করিল। কিন্তু তাহারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়ায় আসিল না।

অবশেষে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্যাসিবিরোধী কমিটির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি হইল। বর্মী জাতীয় বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আউন সানের সহিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চুক্তি হইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হইল।

ভারত-সিংহল (শ্রীলঙ্কা) সম্পর্ক : অতি প্রাচীনকালে ভারতের সহিত সিংহলের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী বিজয়সিংহ ও পরে ওলন্দাজরা সিংহল জয় করিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। প্রথমে পর্তুগীজরা সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল ফ্রান্সের অধিকারে চলিয়া যায়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এ্যামিয়েন্সের সন্ধি দ্বারা সিংহলে ব্রিটিশ অধিকার স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ অধিকার সেইসময় উপকূল রেখা ধরিয়া

সিংহল দ্বীপের চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকারে বিস্তৃত ছিল। মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল কাণ্ডিরাজ্য। এই রাজ্যের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ডির রাজা বিক্রমরাজা সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করা হইল। এইভাবে সমগ্র সিংহল ইংরেজদের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও সিংহলে একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে নাই। সিংহল ছিল সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ শাসিত। উপনিবেশ তাহারা গড়িয়া তোলে নাই। শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে দুইটি দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল কতকগুলি বিশেষ কারণে। উভয় দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিত একই রাজশক্তি। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভারতের চা, কফি, নারিকেল, রবার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া সিংহলের শিল্প সম্পদ বাড়িয়া উঠে। ফলে ভারতীয়গণ সিংহলে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করেন। সিংহলের চা-বাগান ও অন্যান্য শিল্পে বহুসংখ্যক দক্ষিণভারতীয় শ্রমিকদের আগমনের ফলে ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বহু ভারতীয় ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। সিংহল ও ভারত স্বাধীন হইলে সিংহলে ভারতীয়দের বসবাসের প্রশ্ন লইয়া উভয় দেশের সরকারের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) :

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

— ভীতিই ছিল ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের মূল কথা। অকল্যাণ্ডও তাঁহার — নীতির ব্যর্থতার জন্য ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শের আলি — র রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং — দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার ফলে — যুদ্ধ সুরু হইল। ইংরেজরা আফগানিস্তানকে — দেশ হিসাবে রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। — খ্রীষ্টাব্দে সিকিম ও তিব্বতের সীমা নির্ধারিত হয় এবং — সঙ্গে ইংরেজদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দর্জিয়েফ্ ছিলেন — — গৃহশিক্ষক।

2. টীকা লিখ :

(ক) দরজিয়েফ্, (খ) দোস্ত মহম্মদ, (গ) ডুরাণ্ড লাইন, (ঘ) গণ্ডোমুকের সন্ধি।

রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay Type Questions) :

1. ভারত ও আফগানিস্তানের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

2. ভূটানের সহিত ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্কের বিবরণ দাও। 3. ভারত-তিব্বত সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনা কর। 4. ব্রহ্মদেশ ও ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা কর। 5. সিংহলের সহিত ভারতের সম্পর্কের বিবরণ দাও।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

পটভূমিকা

ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনেই এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশের অগ্রগতি ও সংস্কৃতির যে প্রভাব ভারতবাসীর উপর আসিয়া পড়ে তাহা হইতে সৃষ্টি হয় এক গভীর জাতীয়তাবোধের। বিশেষভাবে বাঙ্গালীই ছিল এই নব-জাগরণের অগ্রদূত। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই নানাভাবে এই জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া শাসন-ব্যবস্থায় দেশবাসীর অধিকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পর্যন্ত সবদিক দিয়াই এই জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের সময় হইতেই কিছু কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সব পত্রিকায় দেশবাসীর মতামতের অভিব্যক্তি ঘটিত। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'হিন্দু মেলা' নামক জাতীয় মেলা। ১৮৬৭-তে ইহার সূত্রপাত হয়। জাতীয় ভাবধারার প্রভাব, জাতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন প্রভৃতি ছিল এই মেলার অঙ্গ। সংবাদপত্র প্রকাশও এই সময় হইতে হইতে থাকে। এইসব মনোভাব লইয়াই বাংলায় অনুষ্ঠান ও সংগঠনও কিছু কিছু গড়িয়া উঠিতেছিল।



বঙ্কিমচন্দ্র

এই অবস্থায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন ভারতবাসীর পক্ষে বৈষম্য ও অমর্যাদাসূচক দুইটি আইন তৈয়ারি করিলেন। একটি হইতেছে 'দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act), অপরটি হইতেছে 'অস্ত্র আইন' (Arms Act)। সংবাদপত্র আইনের দ্বারা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর এমন বিধিনিষেধ আরোপিত হইল যাহাতে

তাহারা সরকারের কার্যকলাপের কোন সমালোচনা না করিতে পারে। 'অস্ত্র আইনে' ভারতীয়দের পক্ষে কোন আগ্নেয়াস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হইল। ভারতীয়-দের পক্ষে অমর্যাদাকর এই আইন দুইটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আন্দোলন হইতে লাগিল। আন্দোলন বলিতে তখন অবশ্য শুধু সভা-সমিতির মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের কাছে দাবি জানান ও স্মারক লিপি পেশ করাই বুঝাইত। কিন্তু ইহারই ফলে প্রথম আইনটি নাকচ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন আইনের প্রস্তাব হয়, যাহাতে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজদের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে যেমন ইংরেজরা আন্দোলন করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতীয়রা এই আইনের সমর্থনে পাল্টা আন্দোলন করেন। ইহার ফলে কিছুটা পরিবর্তিত হইয়া এই আইন পাশ হয়। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইলেও ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষেত্রে শুধু ইউরোপীয় 'জুরি' (jury) দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা হয়।



রামকৃষ্ণ



৫

স্বামী বিবেকানন্দ

যাহাই হউক এইভাবে জাতীয় মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনই আন্দোলনকে এক সর্বভারতীয় সংগঠনে রূপ দিবার আগ্রহও দেখা দিল। এই সময়েই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন' (Indian National Conference) নামে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী থাকিলেও অন্য প্রদেশ হইতেও প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধি লইবার দাবি ছাড়াও, বিচারবিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক

করা, সিভিল-সার্ভিস আইনের সংস্কার, শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তন; বেকার-সমস্যা সমাধান প্রভৃতি দাবিও উত্থাপিত হয়। এই জাতীয় সম্মেলনকেই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেস গঠনের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব: যে সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলন করিতেছিলেন, সেই সময়ই এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামক একজন উদারমনোভাবাপন্ন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী ভারতবাসীদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরেজ হইলেও তিনি ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং এ-দেশের রাজনীতির বিষয়েও তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশে এক চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের দেশের কাজে যোগ দিতে আহ্বান করেন। তাহার পর তিনি বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের ভারতীয় নেতৃবর্গের সহিত যোগাযোগ করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে এক সম্মেলনে সকলকে সমবেত করিলেন।



ডব্লু. সি. ব্যানার্জি

এই সম্মেলন হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ডব্লিউ-সি ব্যানার্জি এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হিসাবে ডব্লু. সি. ব্যানার্জির নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেহতা, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কলিকাতায় তাঁহার দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে ব্যস্ত থাকায় বোম্বাইয়ের সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার সহিত মিল ও যোগাযোগ রাখিয়াই জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচী তৈয়ারি হয়। সেই জন্য শেষ পর্যন্ত ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় সম্মেলন' জাতীয় কংগ্রেসের সহিত মিশিয়া যায়।

জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর হইতে প্রতি বৎসর ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইতে থাকে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম গঠন ঠিক যে মনোভাব লইয়া হইয়াছিল, কংগ্রেসের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এ্যালান হিউমের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র ভারতবাসীর মতামত প্রকাশের একটা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈয়ারি করা। সেইজন্য সেই সময়-কার গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিনও এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়া শুভেচ্ছা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু যখনই কংগ্রেস সরকারী কার্যকলাপের স্পষ্ট সমালোচনা আরম্ভ করিল, তখন হইতেই সরকার কংগ্রেসকে মন্দ চোখে দেখিতে লাগিল। প্রথম দিকে কংগ্রেসের নেতারাও ইংরেজ সরকারের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া শুধু অভাব অভিযোগ জ্ঞাপনই করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা নিরর্থক হওয়ায় ক্রমশঃ দাবি আদায়ের জন্য জনমত গঠনের আন্দোলনের পথে কংগ্রেস অগ্রসর হইল। শুধু ভারতে জনমত গঠন করিয়া কিছু হইবে না ভাবিয়া ইংলণ্ডেও ভারতবাসীর পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা হইল। এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একটি কমিটি গঠন করা হইল। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হইল। ইহার কিছু প্রভাব পড়িল ইংলণ্ড-বাসীর একাংশের উপর। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ভারতে আসিয়া জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। তাহার পর ১৮৯২-এ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট 'কাউন্সিল এ্যাক্ট' নামে একটি আইন করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় ভারতীয়দের সদস্য সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিল। কংগ্রেস গঠনের পর ইহাই কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম সাফল্য।

কংগ্রেসের প্রসারে এবং ইহাকে অগ্রগামী করিয়া তুলিতে বাংলার অবদান যথেষ্ট। কংগ্রেস অধিবেশনে মহিলা-সমাজের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা তাহাদের চেষ্টাতেই হয়। প্রথম যে ভারতীয় মহিলা কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন তিনি হইতেছেন বাংলার প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। বাংলার প্রতি-নিধিরাই কংগ্রেস সম্মেলনে সরকারী কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। বিনা বিচারে আটক রাখা, ভাইসরয় কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, দিল্লীর দরবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রতিবাদ জানান।

কিন্তু কংগ্রেস তখনও সরকার-বিরোধিতার দিকে অগ্রসর হয় নাই। বলিষ্ঠ প্রচারের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ করিতে পারিলেই ইংরেজ-সরকার অবহিত হইবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদেরও ইহাই ছিল চিন্তাধারা। এই

মনোভাবের বিরুদ্ধে তখন হইতে কংগ্রেসের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে লাগিল এক অগ্রগামী ভাবধারা। শুধু দাবি জানাইলেই হইবে না, সরকার বিরোধী কর্ম-সূচী লইয়াই কংগ্রেসকে অগ্রসর হইতে হইবে, জনগণের গভীরে কংগ্রেসকে প্রবেশ করিতে হইবে, এই মনোভাবের পুরোধা হিসাবে দাঁড়াইলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় প্রভৃতি। তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় তাত্র ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কথা লিখিতে লাগিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল আসামের চা-শ্রমিকদের উপর ইংরেজ-মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিলেন। এইভাবে তৈয়ারি হইতে লাগিল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি।

স্বদেশী আন্দোলন

এই অবস্থায় এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধকে গভীরভাবে আঘাত করিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। তখন বাংলা প্রদেশ ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মিলিয়া। কার্জন প্রস্তাব করিলেন যে, বাংলার উত্তর ও পূর্ব অংশকে আসামের সহিত জুড়িয়া এক নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে। ইহার কয়েক বৎসর আগে হইতেই কার্জনের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বাংলায় প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতি-নিধির সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনেও বক্তৃতা প্রসঙ্গে কার্জন বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করেন। কলিকাতায় এক বিরাট জনসভায় ইহার প্রতিবাদ করা হয়। বাঙ্গালীর এই বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিবার জন্যই কার্জন বাঙ্গালীর ঐক্যের উপর আঘাত হানিলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ হইবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর সারা বাংলায় জাগিয়া উঠিল এক অভূতপূর্ব বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিল এই সিদ্ধান্ত নাকচ করাইতেই হইবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিলেন। 'The settled fact must be un-settled' ইহাই দাঁড়াইয়াছিল এই আন্দোলনের রণধ্বনি।

এই আন্দোলনে বাংলার সমস্ত মনীষীই সমবেত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্ত সেনের গানে বাংলা মুখর হইল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি, বিপিন পাল প্রভৃতির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সকলকে মাতাইয়া তুলিল। বিশিষ্ট মুসলিম নেতা

আব্দুল রসুল, গজনভী, লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ইহা হইল সকল বাঙ্গালীর এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ১৬ই অক্টোবর, যেদিন বঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইল, সেই দিন বাংলার সর্বত্র প্রতিপালিত হইল রাখীবন্ধন দিবস। পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া বাঙ্গালী ঘোষণা করিল যে, সরকার বাংলাকে বিভক্ত করিলেও বাঙ্গালী এক। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষ্যে বিশেষ গান রচনা করিলেন "বাংলার



রবীন্দ্রনাথ

মাটি বাংলার জল,···বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন এক হউক।" সেই গান গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনা করিলেন। শোকের দিন হিসাবে সেইদিন 'অরন্ধন' পালন করা হইল।

এই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হইতেই গড়িয়া উঠিল এক 'স্বদেশী' আন্দোলন, যাহার উদ্দেশ্য হইল ব্রিটিশের উপর নির্ভরতা বন্ধ করিতে হইবে, বিলাতী পণ্য বর্জন করিতে হইবে, সবকিছু স্বদেশী ব্যবহার করিতে হইবে। বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন হইল ব্যাপক ভাবে। বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় হয় যেসব দোকানে সেখানে পিকেটিং চলিতে লাগিল। বিলাতী কাপড়-চোপড়

সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে তাহা পোড়ান হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে চলিল হস্তচালিত তাঁতের কাপড় পরিবার ও তাঁতশিল্প বাড়াইয়া তুলিবার বিপুল আয়োজন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'—এই গান গাহিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রচার চলিতে লাগিল। 'স্বদেশী' বলিতে শুধু ইহাই ছিল না। ইহার সহিত 'বয়কট'-ও যুক্ত হইয়াছিল। ইংরেজ সরকারের সকল অনুষ্ঠান বয়কট করা, ইংরেজ সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ বয়কট করা প্রভৃতিরও আহ্বান জানান হইয়াছিল। 'বয়কটের' আন্দোলন কোন কোন জায়গায় এমন রূপ লইয়াছিল যে, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে যে সব সরকারী কর্মচারী তাহাদেরও সামাজিক বয়কট করা হইয়াছিল। সরকারও নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল না। বয়কটের রূপ দেখিয়া বেপরোয়া দমন নীতি চালাইতে লাগিল।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করার আন্দোলনের প্রেরণা হইতেই গড়িয়া উঠিতে লাগিল কিছু কিছু জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। যেসব শিক্ষক ও ছাত্র সরকারী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা এইসব জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য একটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হইল। এই পরিষদের পরিচালনাতেই গড়িয়া উঠিল দুইটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান—'ন্যাশন্যাল টেকনিক্যাল কলেজ' ও 'যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'। আজ এই দুটি প্রতিষ্ঠান প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের এই সর্বাঙ্গীণ আয়োজনে বাংলার তখনকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্তান সহযোগিতা করিয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আনন্দমোহন বসু, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি সকলের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব বাংলায় হইলেও উহার প্রভাব পড়িল সর্বত্র। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' ছড়াইয়া পড়িল। বোম্বাইয়ের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় প্রভৃতি এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। তিলক ও লাজপত রায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্বদেশী মেলার উদ্বোধন করিতে আসেন। কংগ্রেসের অধিবেশনেও স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা উঠিয়াছিল। কিন্তু বয়কটের বিষয়টিতে সকলের সমর্থন না থাকায় শুধু স্বদেশী গ্রহণ ও গঠনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই স্বদেশী আন্দোলনের পরই কংগ্রেসের মধ্যে স্পষ্টভাবে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পার্থক্য দেখা দেয়। কংগ্রেসের প্রাচীন নেতারা আবেদন নিবেদনের

পথ ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ সরকার-বিরোধিতার পথে যাইতে রাজী ছিলেন না। অন্য দিকে নবীন নেতারা সরকার-বিরোধিতার কর্মসূচী লইতেই আগ্রহী ছিলেন। দাদাভাই নৌরজী, ডব্লু. সি. ব্যানার্জি, গোখলে প্রভৃতি সকলেই নরমপন্থী বলিয়া গণ্য হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমদিকে চরমপন্থী মনোভাব দেখাইলেও এবং বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসাবে কাজ করিলেও শেষ-পর্যন্ত নরমপন্থীদের সঙ্গেই থাকিলেন। অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি চরমপন্থীদের নেতা হইলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিরোধ এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে কংগ্রেস প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নরমপন্থী-চরমপন্থী পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ায় ইংরেজ সরকারও সুযোগ বুঝিয়া চরমপন্থীদের দমন করিতে তৎপর হইল। লাজপত রায় পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, রাজদ্রোহমূলক লেখার অভিযোগে তিলকের কঠোর কারাদণ্ড হইল, অরবিন্দ ঘোষকে ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হইল। আরও নানাভাবে দমননীতি চলিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের সময় বঙ্গভঙ্গ বিধান প্রত্যাহৃত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (ডব্লু. সি. ব্যানার্জি) : ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের সঙ্গে যাঁহাদের নাম জড়িত, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ডব্লু. সি. ব্যানার্জি নামেই অধিকতর পরিচিত। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন।

ডব্লু. সি. ব্যানার্জি কলিকাতার একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালে তিনি দাদাভাই নৌরজীর সহযোগী হিসাবে ভারতের শাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থার উদ্যোগে ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্পর্কে লণ্ডনে অনেক আলোচনা হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর ইংলণ্ডে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা অপ-প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। সেই অপপ্রচার খণ্ডন করিয়া ভারতবাসীর বক্তব্য ইংলণ্ডবাসীকে জানাইবার জন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 'ব্রিটিশ কমিটি অব ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন ডব্লু. সি. ব্যানার্জি। এই কমিটির পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) : ভারতের জাতীয়

আন্দোলন গঠনে যাঁহাদের অবদান স্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা। কংগ্রেস জননেতা হিসাবে তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে বাংলার 'মুকুটহীন রাজা' বলা হইত। প্রথম জীবনে সুরেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র হিসাবে ইংলণ্ড গমন করেন আই. সি. এস. পড়িবার জন্য। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মতের জন্য সামান্য কারণে তাঁহার চাকুরি যায়। তাহার পর হইতেই সুরেন্দ্রনাথের জীবনধারা পরিবর্তিত হইল এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হইল। তিনি অনেকদিন অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা সকলকে আকৃষ্ট করিত। তিনি অনেকদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ও প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্য ছিলেন।

বাংলাদেশ সুরেন্দ্রনাথের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইলেও তাঁহার কাজ ছিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অধিকার সম্বন্ধে জনমত সংহত করা। এইজন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারে গিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজ সরকার আই. সি. এস. পরীক্ষায় উচ্চতম বয়স কমাইয়া ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধ করিয়া দিল, তখন তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ সারা দেশে ঘুরিয়াছিলেন। ইহার পর দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া যে সরকারী আইন হইল তাহার বিরুদ্ধেও সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ আন্দোলনে অগ্রণী হইলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল উপলক্ষ্যে যে আন্দোলন হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন তাহার প্রধান নেতা। এই বিলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জজদের ক্ষমতার বৈষম্য দূর করার প্রস্তাব ছিল। ইউরোপীয়গণ ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল, সুরেন্দ্রনাথও ভারতীয়দের মর্যাদা রক্ষার জন্য পাল্টা আন্দোলন শুরু করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে কিছুটা পরিবর্তন করিয়া এই আইন পাশ হয়। ইহার পরই আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ দুইমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। দেশবাসীর দাবিকে একটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দাঁড় করানই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই জাতীয় সম্মেলনই হইতেছে জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।

কেননা, একই উদ্দেশ্যে দুই বৎসর পরে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। তখন জাতীয় সম্মেলন জাতীয় কংগ্রেসের সহিত মিশিয়া যায়।

মহারাষ্ট্রের মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। শিবাজী উৎসবের সার্থকতা বুঝিয়া সুরেন্দ্রনাথও বাংলায় শিবাজী উৎসব শুরু করেন। হিন্দু-মুসলিম একতার সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের ছিল গভীর আগ্রহ। এজন্য তিনি মুসলিম সমাজের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড়ে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিদের এক সভায় তিনি যে ভাষণ দেন তাহা বিশেষ আদৃত হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হয় তাহার অন্যতম প্রধান নেতাই ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার 'বোধিনী' পত্রিকায় তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, সরকার যদি তাহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে তাহা হইলে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবে না। সুরেন্দ্রনাথের এই দৃপ্ত ঘোষণাই সার্থক হইল এক প্রবল সরকার-বিরোধী আন্দোলনে। এই আন্দোলন হইতেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন মোড় নিতে পারিয়াছে। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার হিসাবেই ইতিহাসে গণ্য হইয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে যখন 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী' পার্থক্য দেখা দেয় তখন অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের সহিত একমত না হইয়া নরমপন্থীদের সঙ্গেই থাকেন। সেইজন্য বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ গঠনের জন্য সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অবদান সত্ত্বেও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি জাতীয় ধারা হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন।



সুরেন্দ্রনাথ

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০)ঃ সমসাময়িক কালের যে জাতীয় নেতাকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবাসী স্মরণ করে তিনি হইতেছেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক। তিনিই প্রথম সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের মন্ত্র দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। ইংরেজ সরকারের প্রত্যেকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁড়ানোই ছিল তাঁহার নীতি। এই তেজস্বিতার জন্য

তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের আতঙ্ক। ইহারই জন্য তিনি বারবার ইংরেজ সরকারের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিলক খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। ঐ সময় তিনি যুবকদের শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষার জন্য একটি ক্লাব গঠন করেন। এই ক্লাবের সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি যুবক দুইজন অত্যাচারী সরকারী কর্তাকে হত্যা করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেন। তিলককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। কেননা তিনি অত্যাচারী সরকারের কাজের নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এইভাবে তিলক শুরু হইতেই মহারাষ্ট্রে এক জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করেন।



তিলক

তিলকের দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলিত ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা; সেইজন্য তিনি মহারাষ্ট্রের বীর শিবাজীর জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেমের আদর্শকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া 'শিবাজী উৎসবে'র প্রবর্তন করিলেন। আগে মহারাষ্ট্রে শুধু ধর্মীয় ভাব হইতে গণপতি-উৎসব হইত। তিলক তাহার সহিত 'শিবাজী-উৎসব' মিলাইয়া একটি দেশাত্মবোধক জাতীয় উৎসব শুরু করিলেন। 'শিবাজী-উৎসব' শুধু মহারাষ্ট্রেই নহে, অন্যত্রও বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতাতেও শিবাজী উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল।

তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ছিল তদানীন্তন একটি বিখ্যাত পত্রিকা। ইহার মাধ্যমে যে জাতীয়তাবোধ তিনি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে একদিকে যেমন ছিল দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন ভারত গঠনের কথা, তেমনি অন্যদিকে ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা। তিনি দেশবাসীকে শিখাইয়াছিলেন যে, আবেদন জানাইয়া ইংরেজ সরকারের কাছ হইতে কিছু পাওয়া যাইবে না। নিজেদের শক্তির উপর দাঁড়াইয়া দাবি আদায় করিতে হইবে এবং তাহার জন্য যে কোনো দুঃখ

বরণ ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি কোন শাসন-সংস্কারে বিশ্বাস করিতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজই ছিল তাঁহার কাম্য। 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার', ইহাই ছিল তাঁহার বাণী।

কেশরী পত্রিকায় এই তেজস্বী ও নির্ভীক লেখার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তিলকের একাধিকবার কারাদণ্ড হয়। ১৮৯৭-এ প্রথম কারাদণ্ড হয় দুই বৎসর। তাহার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসরের জন্য আর একবার কারাদণ্ড হয়। তখন সরকার 'চরমপন্থীদের' কঠোর হস্তে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিলককে কারারুদ্ধ করিয়াই সরকার নিশ্চিন্ত হইল না; ভারতের মধ্যে তাঁহাকে রাখা বিপজ্জনক ভাবিয়া বর্মার জেলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। এই দীর্ঘ নির্জন কারাবাসও তিলক বৃথা অতিবাহিত করেন নাই। এই সময়ে তিনি 'গীতার ব্যাখ্যা' নামক একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। গীতার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে জাতীয়তাবোধের আলোকে সমুজ্জ্বল করিয়া তিনি সকলের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

জেল হইতে মুক্তি পাইয়া তিলক আবার কর্মরত হইলেন। তখন যুদ্ধের সময়। অন্য সব নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার মনোভাব দেখাইলেও তিলক দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছিলেন যে, শর্তাধীনেই সহযোগিতা হইতে পারে। এই শর্ত হইতেছে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০): তিলকের মত অরবিন্দ ঘোষও ছিলেন সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। কিন্তু তাঁহার জাতীয়তাবোধ ছিল গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করিতেন দেশপ্রেম মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য—শুধু রাজনৈতিক চেতনারই ফল নহে। তাই দেশপ্রেমের বিনাশ নাই, শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও দেশপ্রেম অগ্রসর হইবে। এই বোধ হইতেই অরবিন্দের পথ ছিল দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথ। সেইজন্যই তিনি ছিলেন চরমপন্থী। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পথকে কোনদিনই তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তিনি মনে করিতেন স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে



অরবিন্দ ঘোষ

ইংরেজ শক্তিকে চরম আঘাত দিতে হইবে ; তাহার জন্য দরকার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, আত্মত্যাগের ব্রতে উদ্বুদ্ধ, দেহমনে সবল এক যুবসমাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে এক বিপ্লবী সংগঠন তৈয়ারি করাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। সেইরূপ বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রেরণাই তিনি দিয়া গিয়াছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষের দেশাত্মবোধ কত গভীর ছিল তাহা বুঝা যায় তাঁহার জীবনধারা দেখিলে। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইংলণ্ডে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। আই. সি. এস. পরীক্ষার্থী হিসাবেও তিনি শ্রেষ্ঠদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। দেশসেবাই তাঁহার জীবনব্রত বলিয়া তিনি সরকারী চাকুরির চেষ্টা না করিয়া বরোদার একটি কলেজের সহ-অধ্যক্ষের পদ নিয়াছিলেন। সেখানে থাকিবার সময়ই তিনি তাঁহার পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করিয়াছিলেন। বরোদা হইতে লোক পাঠাইয়া তিনি কলিকাতায় তখন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই কাজ চলিতে লাগিল। এই সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য অরবিন্দ তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে ভার দিয়াছিলেন।

অরবিন্দের প্রকৃত কর্মধারা শুরু হয় বাংলার বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় হইতে। স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য কলিকাতায় তখন 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের পরিচালনায় একটি কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ ঘোষকে সেই কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান হইল। অরবিন্দ বরোদা কলেজের বেশী মাহিনার চাকুরি ত্যাগ করিয়া সামান্য বেতনে এই পদ গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে তিনি অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন। বাংলার বিপ্লবীগণ ছিলেন তাঁহারই মন্ত্রে দীক্ষিত। কলিকাতা হইতে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। বাংলায় থাকাকালেই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে যোগ দিতেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন এই মামলা চলে এবং চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পান। তাঁহার সঙ্গে ধৃত অনেকেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল। বিচারাধীন অবস্থায় জেলে থাকার সময়েই অরবিন্দ গভীর সাধনায় মগ্ন হন এবং মুক্তি পাইবার পর তিনি আর পূর্বেকার

কর্মজীবনে না ফিরিয়া পণ্ডিচেরীতে গিয়া নিজের উপলব্ধি অনুসারে সাধনায় রত হন। তখন হইতে রাজনীতির সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ও তত্ত্বজ্ঞানী রূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধার অধিকারী হন।

অরবিন্দের আদর্শ বাংলার যুবসমাজকে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে শিখাইয়াছিল। তিনি রাজনীতির বাহিরে চলিয়া গেলেও, তাঁহার সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার যুবসমাজ ইংরেজ শক্তিকে আঘাত হানিতে জীবন পণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮)ঃ পাঞ্জাবের সর্বজনমান্য নেতা লালা লাজপত রায় তাঁহার তেজস্বিতা ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের জন্য 'পাঞ্জাব কেশরী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনিও তিলক ও অরবিন্দের মত কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়াই ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই জন্যই তিনি সরকার-বিরোধী সকল সংগ্রামই সমর্থন করিতেন। বাংলায় যে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন হইয়াছিল লাজপত রায় তাহা শুধু সমর্থনই করেন নাই, পাঞ্জাবেও এই আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। সরকার চরমপন্থীদের উপর যখন আঘাত হানিতে আরম্ভ করিল, স্বভাবতই তখনই লাজপত রায়ও বাদ গেলেন না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লাজপত রায়কে প্রথম কারারুদ্ধ করা হয়, পরে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। তখন হইতে লাজপত রায় দীর্ঘদিন দেশের বাহিরে ছিলেন।


লালা লাজপত রায়

যুদ্ধশেষে লাজপত রায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়া জাতীয় আন্দোলনে লিপ্ত হইলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই কংগ্রেসেই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার ফলে তাঁহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। পরে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন-কমিশন বয়কট আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি

দাঁড়াইয়াছিলেন। পাঞ্জাবে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ মিছিল হইয়াছিল তাহার নেতৃত্ব করিবার সময় তিনি পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। সেই আঘাতের কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২): বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে চরমপন্থী মনোভাবের ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হয় ও বাংলায় তিনি চরমপন্থী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি শুধু সাধারণ জাতীয় দাবির প্রতিই নিবদ্ধ ছিল না, আসামের চা শ্রমিকদের উপর ইংরেজ মালিকদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই কংগ্রেস বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত আসাম-কর্তৃপক্ষেরও টনক নড়ে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাহার মধ্য দিয়া জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন।

বাংলার বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রধান শক্তি ছিলেন বিপিনচন্দ্র। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হওয়া উঠিত। শুধু বাংলার মধ্যেই নহে, সারা দেশে ঘুরিয়া তিনি বয়কট ও স্বদেশী প্রচার করিয়াছিলেন। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসাবে ও বাগ্মিতায় তখন বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায় সারা দেশে এরূপ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন যে একসঙ্গে তিনজনের নাম করা হইত 'লাল-বাল-পাল'।



বিপিনচন্দ্র পাল

বাংলায় চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রচারের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় ইংরেজী 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার শীর্ষদেশে লেখা থাকিত 'ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ'। ১৯০৭-১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে চরমপন্থীদের উপর সরকারী আক্রমণ কঠোর হইয়াছিল, সেই সময় বিপিনচন্দ্র পালও রেহাই পান নাই। একটি মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় আদালত অবমাননার দায়ে তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। চরমপন্থীদের উপর সরকারী মনোভাব কঠোর হইবার পর

বিপিনচন্দ্রও দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি আর প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেন নাই।

বিপ্লববাদী আন্দোলন

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতেই বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে বিপ্লবী সমিতি গঠিত হইতেছিল। বাংলায় 'অনুশীলন সমিতি' নামে বিপ্লববাদীদের একটি গুপ্ত সমিতি এই সময় হইতেই তৈয়ারি হইয়াছিল। পরে 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়াও একটি গোষ্ঠী তৈয়ারি হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হইবার পর সরকার বিশেষভাবে চরমপন্থীদের উপর দমননীতি চালাইতে আরম্ভ করিল। রাজদ্রোহ ও অন্যান্য অভিযোগে তিলক, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির কারাদণ্ড হইল। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল জেলের মধ্যেই। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে উদ্বেল বাংলার যুবসমাজকেও দমন করিতে সরকার বদ্ধপরিকর হইল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হইল, সভা-সমিতিতে যোগদান, বিলাতী পণ্যের দোকানে পিকেটিং প্রভৃতির জন্যও কঠিন দণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। ব্রিটিশ শাসকের এই অত্যাচারের জবাব দিবার জন্য গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলিও সংকল্প গ্রহণ করিল। বিপ্লবী সমিতির যুবকরা জানিতেন যে কয়েকজন অত্যাচারী ব্রিটিশ-কর্মচারীকে হত্যা করিলেই ইংরেজ শাসনের অবসান হইবে না। ইহাও তাঁহারা জানিতেন যে, এই কাজে তাঁহাদের মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। কিন্তু পরাধীন দেশের মানুষকে জাগাইতে হইলে, তাহাদের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালাইতে হইলে এই জাতীয় কার্যকলাপ দরকার। ইহার জন্য কয়েকজন যুবকের প্রাণ বলিদান এমন বেশী কিছু নয়। এই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যুবসমাজকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে নির্ভীক হইতে শিক্ষা দিবে। বিপ্লবী সমিতির যুবকগণ দেশ-বিদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস হইতে প্রেরণা লাভ করিতেন, গীতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতেন।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিবার জন্য চৌদ্দ বছরের কিশোর বালক সুশীল ঘোষকে তিনি নিষ্ঠুর বেত্রদণ্ড দিয়াছিলেন। বিপ্লবী সমিতি এই অত্যাচারী শাসককে নিঃশেষ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিল। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপর এই কাজের ভার পড়িল। কিংস্‌ফোর্ড তখন মজঃফরপুরে। ১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোমা

ফেলেন। ঘটনাচক্রে সেদিন সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন মিঃ কেনেডি নামে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রী ও কন্যা। ইঁহারাই বোমায় নিহত হইলেন। ঘটনাস্থল হইতে দুইজনেই পলাইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যপথে তাঁহারা ধরা পড়েন। মোকামা স্টেশনে পুলিশবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলবারে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম কিছু দূরে ধরা পড়িলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হইল। ক্ষুদিরাম নির্ভীকভাবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিলেন।

বিপ্লবীদের কলিকাতার মূল ঘাঁটি ছিল আলিপুরের মুরারিপুকুর বাগানে। সেখানে বোমা তৈয়ারি হইত। পুলিশ হঠাৎ এই ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। ইহারই সহিত জড়িত সন্দেহে অরবিন্দ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করা হইল। আলিপুর বোমার মামলা হিসাবে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হইল সকলের বিরুদ্ধে। চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পাইলেন। অন্য অধিকাংশেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা কারাদণ্ড হইল। পুলিশ বিপ্লবীদের কেন্দ্রের সন্ধান পায় নরেন গোঁসাই নামক দলেরই এক ব্যক্তির কাছ হইতে। এই ব্যক্তি রাজসাক্ষী হইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নরেন গোসাঁইকে আলিপুর জেলের মধ্যেই কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু গুলি করিয়া মারেন। জেলের কঠোর কড়াকড়ির মধ্যেও বিপ্লবীগণ বাহির হইতে গোপনে পিস্তল আনাইয়া এরূপ কাজ করিয়াছিলেন। কানাইলাল ও সত্যেন বসুর বিচারে ফাঁসি হইল।

বাংলার বাহিরেও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ চলিতেছিল। রাসবিহারী বসু ছিলেন উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠনের নায়ক। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হইয়াও তিনি গোপনে এই কাজ করিতেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন গভর্নর জেনারেল শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লী প্রবেশ করিতে-ছিলেন তখন রাসবিহারী বসুর দল তাঁহার উপর বোমা ফেলে। কিন্তু উহা ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী বসু আরো গভীর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইবার আগেই গোয়েন্দা বিভাগ ইহা জানিতে পারে। রাসবিহারী বসুকেই ইহার নেতা হিসাবে জানিয়া তাঁহাকে ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলে। রাসবিহারী বসু পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া কিছুদিন দেশেই ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানে থাকা অসম্ভব বুঝিয়া গোপনে দেশত্যাগ করিয়া জাপানে চলিয়া যান। এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত বলিয়া সৈন্যবিভাগের অনেকের কঠোর দণ্ড হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের আর একটি বিরাট ঘটনা ঘটিল উড়িষ্যার বালেশ্বর অঞ্চলে। বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার নায়ক। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল এই সুযোগে ব্রিটিশ-বিরোধী জার্মানীর সাহায্যে বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানি করিয়া দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটান। বালেশ্বরের কাছে সমুদ্রতীরে অস্ত্রবাহী একটি বিদেশী জাহাজ হইতে অস্ত্র লওয়ার জন্য যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সহকর্মীদের সঙ্গে লইয়া সেই অঞ্চলে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কোন সূত্রে পুলিশ এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের গতিবিধি জানিতে পারিয়া যতীন্দ্রনাথের দলকে ধরিবার জন্য বিরাট বাহিনী লইয়া অগ্রসর হয়। বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, যতীন পাল ও নীরেন দাশগুপ্তের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুলিশবাহিনীর গুলিবিনিময় হয়। বিপ্লবীদের গুলি শেষ হইয়া গেলে পুলিশ তাঁহাদের ধরিতে পারে। যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যু হয় গুলির আঘাতেই। আহত অবস্থা হইতে ভাল হইবার পর আরও দুইজনের বিচার হয়। একজনের প্রাণদণ্ড ও অপরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।



বাঘা যতীন

ভারতের বাহিরেও বিপ্লববাদীদের সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকার প্রবাসী ভারতবাসীদের 'গদর পার্টি' এই সময় হইতেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী উদ্যোগ লইতেছিল। ভারত হইতে অনেক বিপ্লববাদী সেই সময় আমেরিকার এই সমিতির সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। জার্মানীতে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত গদর পার্টির যোগাযোগ হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে 'কোমাগাটামারু' নামক একটি জাহাজে করিয়া বিপ্লববাদীরা ভারতে আসিতেছিল এই সন্দেহ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এই জাহাজের আরোহীদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। বিপ্লবীদের সহিত ব্রিটিশ পুলিশের এক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়।

শাসন সংস্কার

কংগ্রেসের আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিল। **ইহা মর্লে-মিণ্টো সংস্কার** নামে পরিচিত। কিন্তু ইহার দ্বারা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া দূরে থাকুক, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করিয়া ইহা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের পথ প্রস্তুত করিল। হিন্দু-মুসলিম ভেদ সৃষ্টি করা চিরদিনই ইংরেজদের কৌশল ছিল। মুসলিম সমাজের একজন ধর্মীয় নেতা আগা খাঁ চাহিয়াছিলেন মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। ইংরেজ সরকার সেই অজুহাতটাই কাজে লাগাইল মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের মাধ্যমে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের বাহিরে মুসলমান দেশগুলির সহিত ব্রিটিশ সরকারের তখন বিরোধ দেখা দিয়াছিল। সেই বিরোধের প্রভাব ভারতেও মুসলিম সমাজের উপর পড়িয়াছিল। মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ মর্লে-মিণ্টো সংস্কারে খুশী হইল না। তাহারাও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিতে লাগিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত

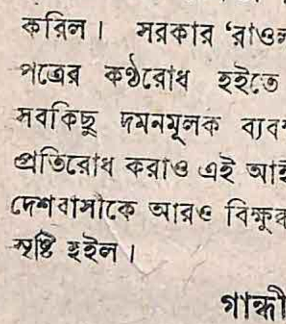
এদিকে তখন ইউরোপের যুদ্ধে জড়িত ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা চাহিতেছে। কংগ্রেসের অধিকাংশের মনোভাবও তখন যুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করার পক্ষে। তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতিদানে সরকার নিশ্চয় শাসন-ব্যবস্থার আরো সংস্কার করিবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই সময়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। শাসন-সংস্কারের বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শও হইতে লাগিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে হিন্দু মুসলমানের অপূর্ব মিলন দেখা গেল। কংগ্রেস দল ইতিপূর্বে যে নরমপন্থী-চরমপন্থী দলে ভাগ হইয়াছিল তাহাও এই সময় অনেকটা দূর হইল। ভারতবাসীর দাবির মধ্যে ঐক্য দেখিয়া ইংরেজ সরকার নূতন শাসন-সংস্কারের জন্য মনস্থির করিল। বলা বাহুল্য এই সময় রুশ-বিপ্লবের ঘটনাতেও ব্রিটিশ সরকার ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১৯-এ মন্টেগু-চেম্‌স্‌-ফোর্ড সংস্কার নামে স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক নূতন ব্যবস্থার ঘোষণা করা হইল।

কিন্তু এই শাসন-সংস্কারে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল অতি সামান্য। এই ব্যবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর শুধু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে), শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের ভার দিয়া অর্থ, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে রাখা হইল। তদুপরি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করিবার অধিকারও দেওয়া হইল ভাইসরয় ও গভর্নরের হাতে। একদিকে আইনসভা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইবে, অন্যদিকে ইচ্ছা হইলেই গভর্নর বা ভাইসরয় তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন এই দুই শাসন-কর্তৃত্বের ব্যবস্থা হইল বলিয়া ইহাকে 'দ্বৈত শাসন' বা Diarchy বলা হইয়া থাকে। ভারতবাসী এই অসম্পূর্ণ ও অন্যায় শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করিল। এই প্রতিবাদ পাছে শক্তিশালী হইয়া উঠে তাহার জন্য সতর্কতা হিসাবে সরকারও নূতন করিয়া দমননীতি অনুসরণ করিল। সরকার 'রাওলাট আইন' নামে একটি আইন পাশ করিয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হইতে আরম্ভ করিয়া আটক, বহিষ্কার, জরিমানা প্রভৃতি সবকিছু দমনমূলক ব্যবস্থার অবাধ ক্ষমতা লইল। রুশ-বিপ্লবের প্রভাব প্রতিরোধ করাও এই আইনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। এই দমনমূলক আইন দেশবাসীকে আরও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। একটা প্রবল আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি হইল।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন

গান্ধীজী তাঁহার কর্মজীবনের প্রথমদিকে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টারী উপলক্ষে। সেখানে ভারতীয়দের উপর সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার সত্যাগ্রহ নীতির শুরু সেই হইতেই এবং তাহাতেই তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের দৃষ্টান্তে কংগ্রেসও উৎসাহিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার হাতেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হইল।


গান্ধীজী

১৯১৯-এ 'রাউলাট এ্যাক্টের' প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন শুরু হইল। ১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হইল। স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট প্রভৃতিও হইতে লাগিল। এই আন্দোলনকে দমন করিতে ইংরেজ সরকারও সর্বপ্রকার ব্যবস্থা লইল। সভা সমিতির উপর, নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইতে লাগিল। নিষেধাজ্ঞা

অমান্যের জন্য গ্রেপ্তারও চলিতে লাগিল। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি পার্কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া একটি জনসভা হয়। সরকারের স্থানীয় সামরিক কর্তা জেনারেল ডায়ারের আদেশে পুলিশ ও মিলিটারি দিয়া এই সভাস্থলকে ঘিরিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করা হইল। ইহাতে কমপক্ষে ৩৭৯ জন নিহত এবং ২০০০ লোক আহত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁহার 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক প্রচণ্ড ঘৃণা লইয়া দেশবাসী আরও দৃঢ় ও ব্যাপক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সময় বিশেষ একটি কারণে মুসলমানদের মধ্যেও ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রচণ্ড হইয়াছিল। তুরস্ক ছিল ইসলামধর্মের সর্বোচ্চ নেতা খলিফার রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম সমাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে লাগিল। ইহারই অংশ হিসাবে ভারতের মুস্‌লিম সমাজও সৌকত আলি, মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে আন্দোলনে অগ্রসর হইল। এই আন্দোলন 'খিলাফৎ' আন্দোলন নামে খ্যাত। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত এই খিলাফৎ আন্দোলন মিলিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হইল। গান্ধীজী-নির্দেশিত অহিংস অসহযোগের কর্মসূচী খিলাফৎ গ্রহণ করিল। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও রাউলাট আইন প্রত্যাহার, অত্যাচারী শাসকদের শাস্তিদান প্রভৃতি দাবির সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের দাবিও জানান হয়। এই দাবির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলনের এক পূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচী ছিল ঃ সরকারী চাকুরি ত্যাগ, সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন, আদালত বর্জন, আইনসভা বর্জন, বিলাতী পণ্য বর্জন প্রভৃতি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং অচিরেই ইহা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের মধ্যে বহু লোক সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিল, বহু উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার আদালত বর্জন করিল। অজস্র শিক্ষক ও ছাত্র স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া দিল। সর্বত্র বিলাতী পণ্য বর্জন ও সরকারী কাজকর্মের সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ হইল।

অসহযোগ আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। কিন্তু যখন দেখিল যে এই আন্দোলন সরকারকে অস্বীকার করার রূপ লইতেছে তখন আক্রমণ শুরু করিল। ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ্

সভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করিবার অধিকারও দেওয়া হইল ভাইসরয় ও গভর্নরের হাতে। একদিকে আইনসভা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইবে, অন্যদিকে ইচ্ছা হইলেই গভর্নর বা ভাইসরয় তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন এই দুই শাসন-কর্তৃত্বের ব্যবস্থা হইল বলিয়া ইহাকে 'দ্বৈত শাসন' বা Diarchy বলা হইয়া থাকে। ভারতবাসী এই অসম্পূর্ণ ও অন্যায় শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করিল। এই প্রতিবাদ পাছে শক্তিশালী হইয়া উঠে তাহার জন্য সতর্কতা হিসাবে সরকারও নূতন করিয়া দমননীতি অনুসরণ করিল। সরকার 'রাওলাট আইন' নামে একটি আইন পাশ করিয়া সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ হইতে আরম্ভ করিয়া আটক, বহিষ্কার, জরিমানা প্রভৃতি সবকিছু দমনমূলক ব্যবস্থার অবাধ ক্ষমতা লইল। রুশ-বিপ্লবের প্রভাব প্রতিরোধ করাও এই আইনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। এই দমনমূলক আইন দেশবাসীকে আরও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। একটা প্রবল আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি হইল।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন

গান্ধীজী তাঁহার কর্মজীবনের প্রথমদিকে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টারী উপলক্ষে। সেখানে ভারতীয়দের উপর সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার সত্যাগ্রহ নীতির শুরু সেই হইতেই এবং তাহাতেই তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের দৃষ্টান্তে কংগ্রেসও উৎসাহিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার হাতেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হইল।


গান্ধীজী

১৯১৯-এ 'রাউলাট এ্যাক্টের' প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন শুরু হইল। ১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হইল। স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট প্রভৃতিও হইতে লাগিল। এই আন্দোলনকে দমন করিতে ইংরেজ সরকারও সর্বপ্রকার ব্যবস্থা লইল। সভা সমিতির উপর, নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইতে লাগিল। নিষেধাজ্ঞা

জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি পার্কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া একটি জনসভা হয়। সরকারের স্থানীয় সামরিক কর্তা জেনারেল ডায়ারের আদেশে পুলিশ ও মিলিটারি দিয়া এই সভাস্থলকে ঘিরিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করা হইল। ইহাতে কমপক্ষে ৩৭৯ জন নিহত এবং ২০০০ লোক আহত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁহার 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক প্রচণ্ড ঘৃণা লইয়া দেশবাসী আরও দৃঢ় ও ব্যাপক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সময় বিশেষ একটি কারণে মুসলমানদের মধ্যেও ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রচণ্ড হইয়াছিল। তুরস্ক ছিল ইসলামধর্মের সর্বোচ্চ নেতা খলিফার রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম সমাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে লাগিল। ইহারই অংশ হিসাবে ভারতের মুস্‌লিম সমাজও সৌকত আলি, মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে আন্দোলনে অগ্রসর হইল। এই আন্দোলন 'খিলাফৎ' আন্দোলন নামে খ্যাত। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত এই খিলাফৎ আন্দোলন মিলিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হইল। গান্ধীজী-নির্দেশিত অহিংস অসহযোগের কর্মসূচী খিলাফৎ গ্রহণ করিল। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও রাউলাট আইন প্রত্যাহার, অত্যাচারী শাসকদের শাস্তিদান প্রভৃতি দাবির সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের দাবিও জানান হয়। এই দাবির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলনের এক পূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচী ছিল ঃ সরকারী চাকুরি ত্যাগ, সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন, আদালত বর্জন, আইনসভা বর্জন, বিলাতী পণ্য বর্জন প্রভৃতি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং অচিরেই ইহা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের মধ্যে বহু লোক সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিল, বহু উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার আদালত বর্জন করিল। অজস্র শিক্ষক ও ছাত্র স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া দিল। সর্বত্র বিলাতী পণ্য বর্জন ও সরকারী কাজকর্মের সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ হইল।

অসহযোগ আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। কিন্তু যখন দেখিল যে এই আন্দোলন সরকারকে অস্বীকার করার রূপ লইতেছে তখন আক্রমণ শুরু করিল। ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ্

ওয়েল্‌স-এর ভারত সফরের দিন সারা ভারতব্যাপী প্রতিবাদ হরতাল পালিত হয়। ইহার পরই সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতীদের কাজকর্মকে বে আইনী ঘোষণা করে ও গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। লাঠিচালনা, গুলিবর্ষণ প্রভৃতি কোন অত্যাচারই বাদ গেল না। সারা দেশে ৪০,০০০ সত্যাগ্রহীকে এই আন্দোলনে গ্রেপ্তার করা হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি কারারুদ্ধ হন। মোতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কংগ্রেসের বহু নেতা কারারুদ্ধ হন।

অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশে বিরাট জাগরণ আনিয়াছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই দেশের মানুষ সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই হিসাবে অসহযোগ আন্দোলন হইতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু। কিন্তু এই আন্দোলন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক এক জায়গায় আন্দোলনকারীরা হিংসার পথে গিয়াছে দেখিয়া গান্ধীজী ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সুযোগ বুঝিয়া ঠিক তাহার পরেই ইংরেজ-সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ও ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

স্বরাজ্য পার্টি ও আইনসভার সংগ্রাম

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর কংগ্রেস-নেতারা নূতনভাবে কাজ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধু দাশ, মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতারা মনে করিতেন যে, এই অবস্থায় আইনসভায় প্রবেশ করিয়া সেখানে সরকার বিরোধিতা করাই বেশী কার্যকর পন্থা। গান্ধীজী, রাজা-গোপালাচারি প্রমুখ নেতারা ইহাতে সম্মত হইলেন না। কংগ্রেসের অধি-বেশনেও আইনসভা প্রবেশ অনুমোদিত হইল না। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহরু প্রভৃতি নেতারা মিলিয়া কংগ্রেসেরই একটি স্বতন্ত্র অংশ হিসাবে 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি দল গঠন করিয়া আইনসভা প্রবেশের পথে অগ্রসর হইলেন। ১৯২৩-এর নভেম্বরে যে নির্বাচন হইল তাহাতে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থীরা বিরাট সাফল্য লাভ করিলেন। মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি আইনসভায় তাঁহাদের যথেষ্ট সভ্য মনোনীত হইলেন। বাংলাতেও স্বরাজ্যদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইল। কেন্দ্রীয় আইনসভাতেও সভ্য সংখ্যা যথেষ্ট হইল; তাহার সহিত মুসলিম লীগের সদস্য মিলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। আইনসভার মধ্যে তাহার পর পদে

পদে সরকার বিরোধী প্রস্তাব জয়ী হইতে লাগিল। অথচ তাহার পরই ভাইসরয় ও গভর্নরের ক্ষমতা প্রয়োগে সেই প্রস্তাব বাতিল হইতে লাগিল। দ্বৈত শাসনের প্রকৃত রূপ, শাসন-সংস্কারের অসারতা এইভাবে পদে পদে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনাও ইহাতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরে মুসলিম লীগ যুক্ত কর্মপন্থা হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে সরকার বিরোধিতার কার্যক্রমে অসুবিধা দেখা দেয়।

এই সময় দেশে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দেখা দেয়। দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি অনেক জায়গায় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়। দেশবাসীর দৃষ্টি সরকার বিরোধিতার দিক হইতে সরিয়া আন্তঃকলহের দিকে চলিয়া যাক ইহা ব্রিটিশ-সরকারই চাহিতেছিল। সাম্প্রদায়িক প্রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

স্পষ্ট কোন আন্দোলন না থাকায় কংগ্রেসের কার্যকলাপ এই সময় গতানুগতিক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এদিকে বিশ্ব ঘটনাবলীর প্রভাবে তরুণ সমাজের মন তখন আন্দোলনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর মাধ্যমে কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ক্রমশঃ জোরাল হইয়া উঠিতেছিল। ১৯২৮-এ কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল তাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর দাবি, এই দুই প্রশ্নের মধ্যে তুমুল বিরোধ দেখা দিল। সুভাষ বসুর নেতৃত্বে অধিকাংশ তরুণ কর্মী পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াইলেন। অন্যরা মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহরু প্রভৃতির নেতৃত্বে সমবেত হইলেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর পক্ষে। ভোটে 'ডোমিনিয়ন



মোতিলাল নেহরু

স্ট্যাটাসের' দাবিই জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু ইহাও ঠিক হইল যে, এক বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি এই দাবি পূরণ না করে তাহা হইলে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হইবে। ইহার পূর্বে ১৯২৭-এ ব্রিটিশ সরকার 'সাইমন কমিশন' নিযুক্ত করিয়াছিল ভারতে কিরূপ শাসন-ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার জন্য। ইহা ব্রিটিশ সরকারের কালক্ষেপ করিবার কৌশল মাত্র, ইহা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে বয়কট করিল।

সাইমন কমিশন যেদিন ভারতে আসিয়া পৌঁছায়, কংগ্রেসের ডাকে সেদিন হরতাল পালিত হয় ও সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়।

এই অবস্থায় ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে বসিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। ইংরেজ সরকারকে দেওয়া চরমপত্রের মেয়াদ শেষ হইবার পর, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি বারটার পর এই অধিবেশনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ঘোষণা করা হইল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। একটি সংকল্প-বাক্য রচনা করিয়া ২৬শে জানুয়ারী সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান করিয়া এই সংকল্প গ্রহণ করিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান হইল।

খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ : স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা আব্দুল গফ্ফর খাঁর নাম বিখ্যাত হইয়া আছে। জাতিতে তিনি পাখতুনী পাঠান। পাখতুনী পাঠানরা এক দুর্ধর্ষ জাতি। কিন্তু আব্দুল গফফর খাঁ ইহাদেরই গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংস পথে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহাদের লইয়া আব্দুল গফফ্র খাঁ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন খোদাই খিদমত্গার নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। খোদাই খিদ্মতগারের অর্থ ভগবানের সেবক। সেই মনোভাব লইয়াই এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গান্ধীজীর নীতি অনুসারে চলিত। ইহাদের পোশাক লাল বলিয়া ইহাকে 'লাল কুর্তা বাহিনী'ও বলা হইত।



আবদুল গফ্ফর খাঁ

আব্দুল গফ্ফর খাঁ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর অসহযোগের

সময় হইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ইহার জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিন বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। ক্রমশঃ তিনি গান্ধীজীর প্রভাবে আসিয়া তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক দেশসেবা, সরল জীবনধারা, অহিংসা নীতিতে গভীর আস্থা ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য চেষ্টা, এই সমস্ত কারণে তিনি 'সীমান্ত গান্ধী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯৩০-এর পর হইতে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি প্রধান নেতাদের অন্যতম হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং গান্ধীজীর প্রধান সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশ বিভাগের পর সীমান্ত-প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য হিসাবে তিনি পাকিস্তানেই থাকিয়া গিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫): ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। দেশের পড়া শেষ করিয়া তিনি বিলাতে যান আই-সি-এস পড়িতে। কিন্তু তাঁহার দেশানুরাগের জন্য কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ ভাজন হওয়ায় তিনি আই-সি-এস-এ যোগদান করিতে পারেন নাই। তখন তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার হইয়াছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে দক্ষতার সহিত মামলা পরিচালনা করিয়া তিনি অরবিন্দকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার খ্যাতি আরও বাড়িয়া গেল।

আইন-ব্যবসায়ে একান্তভাবে লিপ্ত থাকিলেও চিত্তরঞ্জনের দেশানুরাগ প্রথম হইতেই প্রবল ছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সাহায্য দিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশেও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য ছিল। এই পত্রিকার অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম ও আদর্শ-নিষ্ঠা কত গভীর ছিল তাহা বুঝা গেল যখন তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে তাঁহার বিরাট উপার্জনের আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া দেশের কাজে ব্রতী হইলেন। তাঁহার এই ত্যাগ যেন সিদ্ধার্থের রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তপস্বীব্রত লইবার মতই। তিনি উপার্জনও যেমন করিয়াছিলেন, দানও তেমন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এই অবস্থাতেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়াই দেশের কাজে নিজেকে বিলাইয়া

দিলেন। এইভাবে সর্বস্বত্যাগ করিয়া দেশকে ভাল বাসিবার ফলেই দেশবাসী তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়াছে।


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

এই ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আদর্শবোধের জন্যই চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীরও গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। শুধু বাংলার নহে, সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি মূর্তিমান শক্তি ও প্রেরণা রূপে চিত্তরঞ্জনকে সকলে দেখিত। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি নিজে কারাবরণ করেন, এমন কি নিজের স্ত্রী ও পুত্রকেও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শাসন-সংস্কার আইনে যে নূতন আইনসভা গঠিত হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া চিত্তরঞ্জন দেখাইয়াছিলেন কি ভাবে আইন সভার মধ্যেই ইংরেজ সরকারকে পদে পদে বাধা দেওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল প্রভৃতির নেতৃত্বে আইনসভার ভিতরের এই সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হইয়াছিলেন। মেয়র হিসাবে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনকে জাতীয় আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুভাষ বসুর মত যুবনেতাকে তিনি কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়া এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের জটিল অবস্থায় যখন চিত্তরঞ্জনের মত নেতার পরিচালনার দিকে সকলে সাগ্রহে তাকাইয়াছিল, সেই সময়েই আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জাতীয় আন্দোলনের একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল।

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) : এলাহাবাদের প্রখ্যাত আইনজীবী পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর পুত্র জওহরলাল বাল্যকাল হইতে প্রাচুর্যের মধ্যে সাহেবিয়ানার পরিবেশে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেখানে কলেজের পড়া শেষ করিয়া তিনি

ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিয়া পিতার সহিত এলাহাবাদে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে জওহরলাল নেহরুর জীবনধারা পরিবর্তিত হইল। তিনি ও তাঁহার পিতা মোতিলাল নেহরু আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পুরাপুরি কংগ্রেসের কাজে ব্রতী হইলেন।



জওহরলাল নেহরু

তাহার পর হইতে জওহরলাল কংগ্রেসের নানা গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। অনেক দিন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯-এ তিনি প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। সেই হইতেই কংগ্রেসে স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন জোয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশ্বের ঘটনাবলীর দিকে জওহরলালের সর্বদাই গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ১৯২৭-এ ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি রাশিয়ায় গিয়াছিলেন এবং সেখানকার নূতন সমাজব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনে (League against Imperialism) ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসের সামনে এক নূতন ভাবধারা তুলিয়া ধরেন। শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি জনগণের সমস্ত অংশকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়া ব্যাপক শক্তি সৃষ্টি করিবার আহ্বান তিনি জানান। মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী হইলেও জওহরলালের চিন্তা ছিল যুগোপযোগী। সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তাই তিনি দেশের তরুণ সমাজের মনকে বেশী জয় করিয়াছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে সংগ্রামশীল নেতা হিসাবে জওহরলালের

পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আই-সি-এস পাশ করিবার পর তিনি স্পষ্ট জানাইলেন যে সরকারী চাকুরী তিনি করিবেন না। প্রস্তাবিত চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সরাসরি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে গিয়া তাঁহার নেতৃত্বাধীনে দেশের কাজে ব্রতী হইলেন।

সুভাষচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, কর্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা দেখিয়া চিত্তরঞ্জনও বুঝিয়াছিলেন যে একজন খাঁটি কর্মীকে তিনি পাইলেন। তাই তিনি প্রথম হইতেই সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার প্রধান সহকর্মী হিসাবে কাজে লাগাইলেন। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া গান্ধীজীর সহিত চিত্তরঞ্জনের যখন মতভেদ হয় তখন তিনি 'ফরোয়ার্ড' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্রকে করা হয় উহার পরিচালক সম্পাদক। কলিকাতার মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিযুক্ত করেন। এই পদে থাকাকালীন কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রকে সরকার বিনা বিচারে আটক করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশের জেলে বন্দী করিয়া রাখে। জেলের মধ্যে চরম স্বাস্থ্যভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই ; আটক বন্দী অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র বাংলার আইনসভায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন।


সুভাষচন্দ্র

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া সুভাষচন্দ্র আবার কাজে ব্রতী হইলেন। বাংলার যুবসমাজ সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিল। এদিকে সরকারও সুভাষচন্দ্রকে দমন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি একাধিকবার কারারুদ্ধ হইলেন। এই কারাবাসে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সরকার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাইবার অনুমতি দিল। তখন হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইউরোপে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি দেশে ফেরেন।

আপসহীন কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্রের সহিত গান্ধীজীর মতভেদ গোড়া

হইতেই ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস-সভাপতিত্বের জন্য গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা বাধার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন তিনি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক নূতন দল গঠন করেন। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ হন। এই অবস্থায় জেলে অনশন করিলে তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দিয়া গৃহে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। সেই অবস্থাতেই গোয়েন্দাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া সুভাষচন্দ্র একদিন অন্তর্ধান করিলেন। তখন হইতেই শুরু হইল তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের চরম অধ্যায়।

সুভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন জার্মানীতে। সেখানে যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া একটি সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। তাহার পর সেখান হইতে জাপানে আসিয়া আরও সুপরিকল্পিত ভাবে এই বাহিনী গঠিত হইলে তাহার নাম হয় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র এই সময় হইতেই নেতাজী নামে খ্যাত। এই আজাদ হিন্দ বাহিনী লইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছান তাঁহার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর তাঁহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৯৪৫-এ একটি বিমানে করিয়া জাপানে চলিয়া যাওয়ার সময় বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রকাশ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহার জ্বলন্ত দেশপ্রেম, সংগ্রামী নীতি ও আত্মত্যাগের জন্য। অহিংস পথে না হইলে সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই দেশকে মুক্ত করিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। তাঁহার 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ভারতবাসীর কাছে গণ্য হইয়াছে এক নূতন শক্তিরূপে।

বিপ্লববাদী কার্যকলাপের পুনরভ্যুত্থান ঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপ বন্ধ ছিল। কিন্তু পরে আবার তাহা বাড়িয়া গেল। শুধু বাংলায় নহে, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি জায়গাতেও বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব সংগঠনের বিপ্লবীরা নানাভাবে ইংরেজ শাসককে আঘাত করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। বাংলায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারিবার চেষ্টা করেন গোপীনাথ সাহা। দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকে ধরা পড়েন। জেলের মধ্যে সহকারী পুলিশ-কমিশনারকে হত্যা করা

হয়। উত্তরপ্রদেশে ট্রেন হইতে সরকারী অর্থ লুট করিবার চেষ্টা হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভগৎ সিং কেন্দ্রীয় আইন সভার মধ্যে বোমা ফেলিয়া সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অনেকে ধরা পড়েন। ভগৎ সিং ও অন্যান্য অনেকের ফাঁসি হয়। ১৯৩০-এ বাংলায় ঘটিল আর এক বড় ঘটনা। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্য সেন ও তাঁহার সহকর্মীদের সহিত ইংরেজ-বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ ইতিহাসের বস্তু হইয়া আছে। পরে ধরা পড়িয়া সূর্য সেনের ফাঁসি হয়। কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকিয়া বিনয়, বাদল, দীনেশ আক্রমণ করিলেন ইংরেজ কর্মকর্তাদের। 'অলিন্দ যুদ্ধ' (Corridor battle) বলিয়া খ্যাত হইয়া আছে এই ঘটনা। বিপ্লবীদের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকলাপ চলিতেছিল এই সময়। বাংলার নারীরাও পিছাইয়া ছিলেন না। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সম্মুখ-যুদ্ধ, শান্তি ও সুনীতির দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা, কলিকাতায় গভর্ণরের উপর বীণা দাসের আক্রমণ– এইসব কাহিনী ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ইহারই পাশে পাঞ্জাবের জেলে ভগৎ সিং-এর সহকর্মী বাংলার যতীন দাসের অনশন দ্বারা মৃত্যু-বরণ এক স্মরণীয় ঘটনা। রাজ-বন্দীদের মর্যাদারক্ষার জন্য যতীন দাস আত্মাহুতি দিয়াছিলেন।

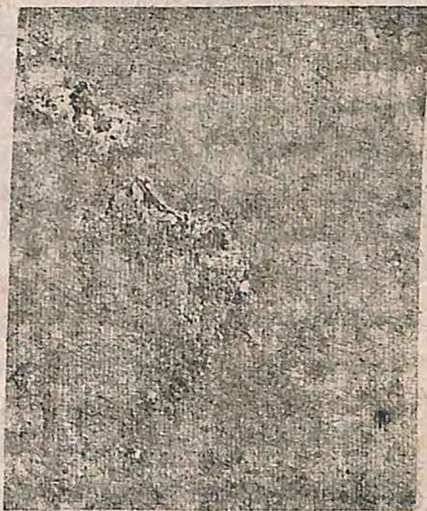


সূর্য সেন



বিনয় বসু

ভারতের বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপও স্মরণীয়। আমেরিকার প্রবাসী পাঞ্জাবীরা 'গদর পার্টি' নামে এক বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন। ইউরোপের ভারতবাসীদের উপরও ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। ভারতীয়দেরই আর এক দল সেই সময় রুশবিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রাশিয়ায় গিয়া ভারতের বিপ্লবের পথ প্রস্তুতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিয়া আসিলে ইহাদের অনেককেই সরকার কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারাদণ্ড দেয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এই উদ্দেশ্যেই সরকার করিয়াছিল।



বাদল গুপ্ত

ভারতের বাহিরে গিয়া দেশের মুক্তি আন্দোলনে যাঁহারা বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিপ্লবী নায়কগণের মধ্যে এম. এন. রায় এক অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জন্ম চব্বিশ পরগণার আড়বেলিয়া। অল্প বয়সেই তিনি জাতীয়তাবাদ ও ভারতের মুক্তি সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিবনারায়ণ স্বামী ছিলেন তাঁহার রাজনীতিক দীক্ষাগুরু। বাল্যকালে নিজ গ্রামে কয়েকটি বন্ধুবান্ধব লইয়া একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরে



দীনেশ গুপ্ত

তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ধৃত হন। গার্ডেনরীচে যে প্রথম মোটর ডাকাতি হয় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার নেতা (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।



মানবেন্দ্রনাথ রায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনাইয়া দেশে বিপ্লব ঘটাইতে যে চেষ্টা হয় মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। এই উদ্দেশ্যে তিনি মিঃ মার্টিন ছদ্মনামে দুইবার বাটাভিয়া যান। জার্মান অস্ত্র পাওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে তিনি আমেরিকা চলিয়া যান এবং এম. এন. রায় নাম গ্রহণ করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকায় তাঁহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হইলে তিনি আমেরিকা হইতে মেক্সিকো পলাইয়া যান। মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠন করিয়া একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রূপে পরিচালিত করেন।

মেক্সিকো হইতে তিনি মস্কো যান। লেনিন তখন রাশিয়ার কর্ণধার। তিনি রায়ের চিন্তাধারা এবং কর্মশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোমইনটার্নের কার্যকরী সমিতি ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত করেন। পরে উক্ত নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি নেতৃত্ব হইতে সরিয়া আসেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন ত্যাগ করেন।

ভারত সরকার রায়ের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর জিয়াউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং পাঁচ বৎসর তাঁহার জেল হয়। কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবার জন্য প্রথমে তিনি লীগ অফ্ র‍্যাডিকাল কংগ্রেস গঠন করেন। কিছুদিন পরে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া নূতন র‍্যাডিক্যাল পার্টি স্থাপন করেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি র‍্যাডিক্যাল পার্টির বিলোপ করিয়া নূতন রাজনৈতিক তত্ত্ব র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম্ প্রচার করিতে থাকেন। ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এই নূতন তত্ত্ব আলোচনার কেন্দ্র আছে।

দেরাদুনে পাহাড় হইতে পতনের ফলে তিনি বুকে আঘাত পান এবং ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন ও পরবর্তী অবস্থা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ৬ই এপ্রিল হইতে। এইদিন গান্ধীজী প্রথম লবণ-আইন অমান্য করেন। তিনি ১৮ই মার্চ ৭৮ জন অনুচর লইয়া সমুদ্রোপকূলের ডাণ্ডি অভিমুখে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইহা গান্ধীজীর 'ডাণ্ডি মার্চ' বলিয়া বিখ্যাত। সেই হইতে সারা দেশে শুরু হইল ব্যাপক আইন-অমান্য। লবণ-আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত করা, বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য, রাজদ্রোহ, আইন অমান্য প্রভৃতি বহুবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ চলিতে লাগিল। অনেক জায়গায় ট্যাক্স বন্ধ চলিল। ব্রিটিশ সরকারও প্রচণ্ড দমননীতি চালাইল। কমপক্ষে, ৬০,০০০ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গান্ধীজী প্রমুখ সমস্ত কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হইলেন, লাঠি গুলিও চলিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আব্‌দুল গফ্‌ফর খাঁ তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী লইয়া আন্দোলনে যোগ দিলেন।

এই সময়েই সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে লণ্ডনে এক গোল-টেবিল বৈঠক ডাকা হইল। কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করিল। ইংরেজ-সরকার দেখিল যে কংগ্রেস যোগ না দিলে এই বৈঠকের কোন মূল্য থাকে না। তখন সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সাময়িক মীমাংসায় আসিল। গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হইল এবং গান্ধীজীর সহিত বড়লাট আরউইনের এক চুক্তি হইল যে, সমস্ত আইন-অমান্যকারীদের মুক্তি দিলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন। এই চুক্তি 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' নামে খ্যাত। গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন, কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধি-দের অনমনীয় সাম্প্রদায়িক দাবির জন্য বৈঠকে কোন ফল হইল না। ইহার পর স্থগিত আইন-অমান্য আন্দোলন আবার দ্বিগুণ জোরে আরম্ভ হইল। সরকারও আরও কঠোর দমননীতি চালাইতে লাগিল। নূতন অর্ডিনান্স জারী হইল, লাঠি, গুলি বেপরোয়া চলিল। সম্পত্তি ক্রোক, পাইকারি জরিমানা প্রভৃতি উৎপীড়নের সকল পদ্ধতিই অনুসৃত হইতে লাগিল। এই সময় গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল এক লক্ষেরও বেশী। সরকার আবার গোল-টেবিল বৈঠক ডাকিল। কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে যোগ দেয় নাই।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের মনোভাবকে উপেক্ষা করিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থার এক ঘোষণা করিল। ইহা ছাড়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচনের কথা জানান হইল। অনুন্নত সম্প্রদায়কে এইভাবে অন্য সকলের নিকট হইতে পৃথক

করিবার চেষ্টার প্রতিবাদে গান্ধীজী অনশন করিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে মীমাংসা হওয়ায় এই স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা বন্ধ হইল। অবশ্য মুসলিমদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা রহিয়া গেল। আইন-অমান্য আন্দোলন তখনও চলিতেছে কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টি তখন সেদিক হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করিলেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে।

নূতন শাসন-সংস্কার হিসাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন-আইন পাশ হইল। এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের অধীন প্রদেশগুলি লইয়া এক যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থায় আসিতে পারে এই অধিকার তাহাদের দেওয়া হইয়াছিল। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির অধিকার আগের অপেক্ষা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তবু গভর্নরের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিল। এই শাসন সংস্কার উপযুক্ত না হইলেও কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল এবং এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। ভাইসরয় বা গভর্নর মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর কংগ্রেস এই সমস্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। বাংলায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে না পারায় এখানে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা হওয়ায় দেশে এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হইল। জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু কাজ করা সম্ভব হইল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলেই আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছিল এবং বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীরাও মুক্তি পাইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামের নীতি ও কৌশল লইয়া সুভাষ বসুর সহিত গান্ধীজী ও তাঁহার অনুগামীদের মতভেদ বাড়িতে লাগিল এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত মতভেদ এমন রূপ লইল যে সুভাষ বসুকে সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং স্বতন্ত্র দল হিসাবে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাতীয় কংগ্রেস

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে দাঁড়াইল জার্মানী, ইটালী ও জাপান, যাহাকে বলা হইত 'অক্ষশক্তি' এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া যাহাকে 'মিত্রশক্তি' বলা হইত। ভারতবাসীর মতামত না লইয়াই ভারতকে যুদ্ধে জড়ান হইয়াছিল। জার্মানী ও ইটালীর

ফ্যাসিজম্ তখন সমস্ত পৃথিবীর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে বিপদজনক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও ফ্যাসিজম্‌কে নিন্দা করিয়াছে। কংগ্রেস জানাইল যে এই যুদ্ধ ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য যদি সত্যই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হয়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা না বলায় কংগ্রেস প্রতিবাদে মন্ত্রি-সভা ত্যাগ করিল। ইহার পর ব্রিটিশ পক্ষ যখন যুদ্ধে পিছু হটিতে লাগিল তখন কংগ্রেস আবার জানাইল যে যদি যুদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া হয় এবং বর্তমানে যদি কংগ্রেসকে লইয়া একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়, তাহা হইলে সেই সরকারের পক্ষ হইতে ভারতবাসী যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশ সরকার রাজী হইল না। সরকার এইটুকু বলিল যে যুদ্ধের শেষে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বান করা হইবে। ইতিমধ্যে মুসলীম লীগের 'পাকিস্তান' দাবিও দৃঢ় হইয়াছে। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকারও জানাইল যে শুধু কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। যুদ্ধকালের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া একটা যুদ্ধ-মন্ত্রণা পরিষদ গঠন ছাড়া আর কোন কিছুই করিতে সরকার রাজী হইল না। এদিকে তখন জাপান ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে ব্রিটিশ সরকারকে সরিয়া আসিতে হইয়াছে। এই সঙ্গীন অবস্থায় ভারতবাসীর সহিত মীমাংসা করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ যে প্রস্তাব দিলেন তাহাতে এমন একটি শর্ত ছিল যে, কংগ্রেস তাহা মানিতে পারিল না। ক্রিপ্‌স-এর শর্ত ছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি বা কোন প্রদেশ যদি স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করিতে চায়, তাহা করিতে পারিবে। এই শর্ত ভারতকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করারই কৌশল। সেই জন্যই কংগ্রেস ইহাতে রাজী হইল না। পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃত না হওয়ায় মুসলিম লীগও ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

ভারত ছাড় আন্দোলন

ক্রমশ: যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন হইল যে ব্রিটিশ সরকারের উপর দেশবাসীর আর ভরসা রহিল না। এই অবস্থায় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত লইল যে ভারতের ভাগ্য ভারতবাসী নিজেদের হাতেই লইবে এবং এখনই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ১৯৪২-এর ১৪ই জুলাই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কামটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিল তাহাতে বলা হইল, "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের

এখনই অবসান ঘটাইয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ দরকার। শুধু ভারতের স্বার্থেই নহে, পৃথিবীকে ফ্যাসিজ্‌ম্‌, মিলিটারিজম্‌ ও অন্য যে কোন রূপের সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে ত্রাণের জন্যও ইহা দরকার।” ইহার পর ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের সাধারণ সভায় ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। কিন্তু আন্দোলন শুরু হইবার পূর্বেই ৯ই আগস্ট সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রেপ্তারের পূর্বে গান্ধীজী দেশবাসীকে ডাক দিয়াছিলেন ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ (হয় করিব না হয় মরিব)। নেতাদের গ্রেপ্তারের পর দেশবাসী এই ধ্বনি লইয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হরতাল, ধর্মঘট হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বহু প্রকারের আন্দোলন আরম্ভ হইল। বহু জায়গায় সরকারের কাজকর্ম অচল করিয়া ফেলা হইয়াছিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব তখন জনসাধারণের হাতে চলিয়া গিয়াছে। সেই আন্দোলন স্বভাবতই কোথাও অহিংস পদ্ধতিতে হইল, কোথাও বা জনবিক্ষোভ অহিংসার সীমারেখা ছাড়াইয়াও গেল। সারা দেশব্যাপী এই আন্দোলনের জোয়ারকে স্তব্ধ করিতে ব্রিটিশ সরকারও মরিয়া হইয়া আক্রমণ চালাইল। গ্রেপ্তার হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠি, গুলি, জরিমানা অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার শুরু হইল। প্রায় দশ হাজার মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল। এক লক্ষেরও বেশী মানুষ গ্রেপ্তার হইয়াছিল। কিন্তু কোন দমননীতি দিয়াই সরকার এই আন্দোলন বন্ধ করিতে পারে নাই। দেশবাসী তখন এক চরম সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।

এই আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। বাংলায় মেদিনীপুর জেলার তমলুকে, বিহারের বালিয়া জেলায় ও আরও কয়েকটি জায়গায় ইংরেজ-শাসনকে অস্বীকার করিয়া পাল্টা স্বাধীন সরকার গঠন করা হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গায় কিছুদিনের জন্য ইংরেজ শাসন অচল হইয়া গিয়াছিল। তমলুকের বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরার ঘটনাও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। ৭৩ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা স্বাধীনতার পতাকা হাতে লইয়া একটি মিছিলের নেতৃত্ব করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পুলিশথানায় সেই পতাকা প্রতিষ্ঠিত করা। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এই মিছিলের



মাতঙ্গিনী হাজরা

উপর পুলিশ লাঠি ও গুলি চালায়। মাতঙ্গিনী হাজরার হাত হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহার উপর বারবার লাঠির আঘাত করা হয়। গুলি করা হইল। স্বাধীনতার পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াই বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলিতে লাগিল, সরকারের দমননীতিও অব্যাহত রহিল। এই অবস্থায় গান্ধীজী জেলের মধ্যে একুশ দিনের জন্য অনশন করিলেন সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে। অনশনে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইলেও সরকার তাঁহাকে মুক্তি দেয় নাই। ইতিমধ্যে সরকারী নীতির ফলে পূর্বাঞ্চলের খাদ্যশস্যের বেশীর ভাগ যুদ্ধের প্রয়োজন মিটানর জন্য চলিয়া গিয়াছে, বাংলার গ্রামাঞ্চল খাদ্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৩-এ বাংলায় দেখা দিল এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, যাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল। সারা দেশ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৯৪৫-এ পরিস্থিতির মোড় ঘুরিল জাপানের পরাজয়ের ফলে। তখন ভারতের সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার আবার নূতন ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইল। সরকার সিমলায় একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করিল এবং ইহাতে যোগদানের সুযোগ দিবার জন্য কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইল।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়া সুভাষচন্দ্রের প্রধান চেষ্টা হইয়াছিল যুদ্ধের সুযোগে বাহির হইতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। জার্মানী ও জাপান গভর্নমেন্টের সাহায্যে তিনি যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারও তিনি গঠন করিয়াছিলেন যাহার প্রধান হিসাবে তিনি সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেন। সিঙ্গাপুর এই আজাদ হিন্দ সরকারের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই আজাদ হিন্দ সরকার পুরাপুরি একটি স্বতন্ত্র গভর্নমেন্টের মতই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। এই সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ছিল এবং এক একজনের উপর এক এক দপ্তরের ভার ছিল। সুভাষচন্দ্রের গঠিত এই আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের পিছনে প্রবাসী ভারতীয়দের বিপুল সমর্থন ছিল।



নেতাজী

সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের অনেক অর্থবান ভারতীয় প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য।

আজাদ হিন্দ ফৌজও এক সুশৃংখল সৈন্য বাহিনী হিসাবে গঠিত হইয়াছিল। জেনারেল মোহন সিং হইয়াছিলেন ইহার প্রধান সেনাপতি। এই ফৌজের এক একটা বাহিনী গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার এক একজন সেনাপতি ছিলেন। সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু সমস্ত বাহিনীর কাজ পরিচালনা করিতেন। আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে সকলে 'নেতাজী' বলিত। ইহা শুধু পদমর্যাদার নামই ছিল না, স্বাধীনতার আদর্শে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার ও বাহিনীর সকলকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, সকলে তাঁহার সহিত এক মনপ্রাণ হইয়া বীরত্ব সহকারে ত্যাগ ও মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প লইয়া কাজ করিত। এই জন্যই সুভাষচন্দ্র বসু হইয়া উঠিয়াছিলেন সকলের নেতাজী এবং তখন হইতে সকলের কাছেই তিনি নেতাজী হিসাবে পূজ্য হইয়াছিলেন। এক অপূর্ব হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক ছিল এই বাহিনী। 'দিল্লী চলো'—ইহাই ছিল এই বাহিনীর প্রত্যেকটি অভিযানের ধ্বনি। নারী সমাজকেও নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাই-এর বীরত্বের স্মৃতিতে 'ঝান্সি বাহিনী' নামে মেয়েদের লইয়া একটি সাহায্যকারী বাহিনী তিনি গঠন করিয়াছিলেন। পূর্ণ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই নারী বাহিনী নেতাজীর এক অপূর্ব কৃতিত্ব। আজাদ হিন্দ ফৌজের দখলে আসিয়াছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ। এই দ্বীপ দুটিকে তিনি শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ হিসাবে নামকরণ করেন। আসামের কোহিমা, বিষণপুর প্রভৃতিও দখল হইয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সমস্ত অভিযানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া পরিচালনা করিতেন।



শাহনওয়াজ খান

কিন্তু জাপান যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হওয়ায় আজাদ

হিন্দ ফৌজের অবস্থাও সঙ্গীন হইয়া পড়িল। ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর ইংরেজ পুনর্দখল করিল এবং তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল বন্দী হইল। এই পরাজয়ের পর নেতাজী ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সংকল্প করিলেন। বিমানে করিয়া ফর্মোজা পৌঁছিবার পর সেখান হইতে আবার যাত্রা করিবার সময় বিমান ধ্বংস হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়—ইহাই পরবর্তী খবরে জানা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত বন্দীকে ইংরেজ সরকার ভারতে আনিয়া লালকেল্লায় আটক করিল এবং ইহাদের নেতা মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ, ধীলন প্রভৃতির বিরুদ্ধে মামলা আনিয়া কঠোর শাস্তিদানের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহিনী সারা ভারতে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক বলিয়া ইহারা দেশবাসীর কাছে বিপুল সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। ইহাদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিরাট আন্দোলন হইল। সেই আন্দোলনেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। এই আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। যদিও জার্মানী ও জাপান গভর্নমেণ্টের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল তবু সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই এই বাহিনীকে পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ স্বীকার না করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য লইয়াই ইহারা চলিয়াছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্য না হইলেও ইহার প্রভাব জনগণের উপর এবং ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা-বাহিনীর উপরও পড়িয়াছিল। ইংরেজ সরকারকে ইহা বিশেষভাবে আতঙ্কিত করিয়াছিল।

ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ ও তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা

১৯৪৫-এর মধ্যভাগে যখন জাপানের পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিন্ত হইল, তখন ভারতের সম্বন্ধে আবার নূতন ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা শুরু হইল। সিমলায় একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে আহ্বান করা হইল। এই সম্মেলনের পূর্বে গান্ধীজী মুসলিম লীগ নেতা জিন্নার সঙ্গে আপস মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জিন্না পাকিস্তানের দাবিতে অটল রহিলেন। এই কারণে সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইল। এদিকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নূতন নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া

শ্রমিক দল সরকার গঠন করিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন ক্লীমেন্ট এটেলি। শ্রমিক দলের সরকার ভারত সম্বন্ধে নূতন নীতি অনুসরণ করিল। এই সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইল যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর একটি গণপরিষদ আহ্বান করা হইবে এবং তাহার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা হইবে। ইতিমধ্যে দেশের আবহাওয়া আরও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছে। আই. এন. এ-র নেতাদের বিচারকে উপলক্ষ্য করিয়া নেতাদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা ব্রিটিশ সরকারকে আরও আতঙ্কিত করিল। নৌবাহিনীর একটি অংশের নাবিকেরা বিদ্রোহ করিল ১৯৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী। বিদ্রোহী নৌবহর কর্মীদের উপর সরকারী আক্রমণ হইলে তাহার বিরুদ্ধে দেশ জুড়িয়া যে তুমুল আন্দোলন হইল তাহাতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অপূর্ব প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। দেশের এই বিস্ফোরক পরিস্থিতি দেখিয়া ইংরেজ সরকার বুঝিল যে, ভারতে তাহাদের শাসন বজায় রাখা আর সম্ভব হইবে না। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপুল সাফল্য ও ইউরোপের অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশের ক্ষমতাও যথেষ্ট কমিয়া গেল। এই সমস্ত কারণেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত হইল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন হইল তাহাতেও সাধারণ আসনে কংগ্রেস ও মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সভাতেই বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হইল। ইহার পরই ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের তিনজন সদস্য লইয়া একটি দল ভারতে পাঠাইল ভারত-বাসীর সহিত শাসন-ব্যবস্থার সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য। এই দলকে 'ক্যাবিনেট মিশন' বলা হয়। মুসলিম লীগের অনমনীয় পাকিস্তান দাবির জন্য ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কোন মীমাংসা যখন হইল না তখন ক্যাবিনেট মিশন নিজেদের দায়িত্বেই ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করা হইবে এবং তাহার পূর্বে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে। পাকিস্তান গঠনের দাবি ক্যাবিনেট মিশন স্বীকার করেন নাই, তবে কিরূপ সংবিধান গণপরিষদ গঠন করিবে তাহার একটা পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছিল এই যুক্তিতে যে, সংবিধান

রচনার দায়িত্ব গণপরিষদের হ'তেই থাকিবে। কিন্তু মুসলিম লীগের সন্দেহ হইল যে, তাহার পছন্দ মত সংবিধান গণপরিষদে রচিত হইবে না এবং তাই শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মানিতে অস্বীকার করিল। ঠিক এই কারণেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনেও মুসলিম লীগ রাজী হইল না। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজী হইল এবং পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য উদ্যোগ আরম্ভ হইল। লর্ড ওয়াভেল তখন ভাইস্‌রয়। তিনি মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ কিছুতেই আসিল না।

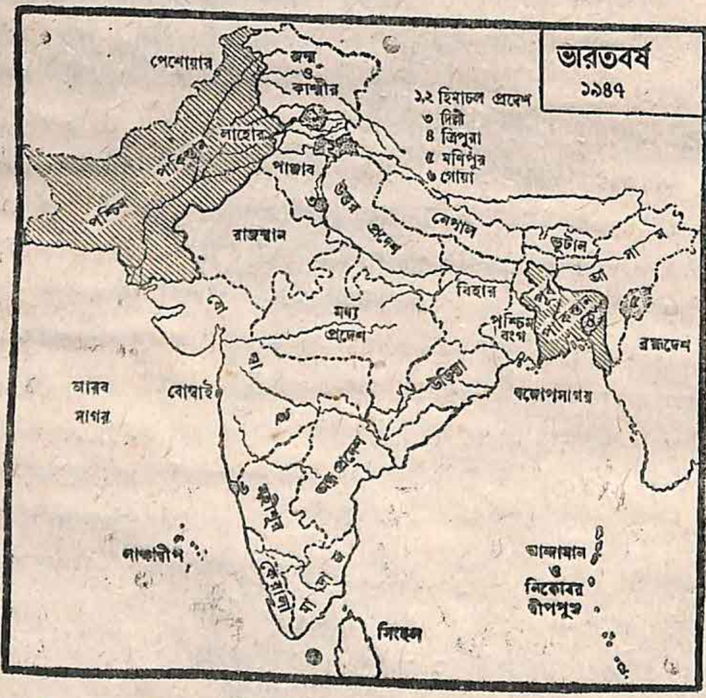
তখন হইতেই মুসলিম লীগের মনোভাব অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোন মীমাংসার দ্বারা পাকিস্তান দাবি আদায় করা যাইবে না বুঝিয়া জিন্না দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে তাঁহারা সংগ্রামের জোরে এই দাবি আদায় করিয়া লইবেন। ইহারই জের হিসাবে ঘটিল কলিকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের বীভৎস হত্যালীলা। ঐদিন হইতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাংলার অন্যান্য স্থানে এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বমুহূর্তে একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইল।

এই অবস্থায় ওয়াভেলের বিশেষ চেষ্টায় মুসলিম লীগও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল বটে, কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুইয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন ঐক্য না থাকায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকর্মে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, ভারতে আর অনিশ্চিত অবস্থা চলিতে দেওয়া হইবে না। ১৯৪৮-এর মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিবে। এদিকে তখন বাংলার মত হত্যাকাণ্ড পাঞ্জাবেও আরম্ভ হইয়াছে। অবস্থা অত্যন্ত জটিল দেখিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত দায়িত্ব দিয়া ভারতে পাঠাইল ভাইসরয় হিসাবে। তখন দেশের অবস্থা যেরূপ তাহাতে ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা আর ভাবা যায় না। তাই কংগ্রেস-নেতারাও ভারত-বিভাগে রাজী হইলেন। মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলি লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইবে ও অন্য অঞ্চলগুলি লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন হইবে, এই মীমাংসা হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিকে পৃথক করিয়া পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে ইহাও স্থির হইল। আসামের

শ্রীহট্ট জেলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করিল যে তাহারা পাকিস্তানে যোগ দিবে।

স্বাধীন ভারতের জন্ম

এই ব্যবস্থার পর ব্রিটিশ সরকার পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করিল এবং ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইল। ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে দিল্লীতে ভারতের গণপরিষদের অধিবেশনে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল রূপে স্বীকার করা হইল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরু অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে একযোগে শপথ লইলেন। আগে হইতেই ব্রিটিশ সৈন্যের ভারত-ত্যাগ আরম্ভ হইয়াছিল। এখন দ্রুত তাহা কাজে পরিণত হইল। ভারত ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত হইল। ভারত বিভাগ অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও স্বাধীন ভারতের জন্ম দেশবাসীর মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল গান্ধীজী ভারত-বিভাগ পছন্দ করেন



নাই। কিন্তু অবস্থার জটিলতা দেখিয়া তিনি এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

ইহার পর গণপরিষদে ভারতের নিজস্ব সংবিধান রচিত হইল এবং ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারী হইতে সেই সংবিধান অনুযায়ী ভারত হইল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিছুদিন পরেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন চলিয়া যাওয়ায় চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গভর্নর জেনারেল হইয়াছিলেন। তাহার পর নূতন সংবিধান অনুসারে নূতন নির্বাচনের পরে প্রথম রাষ্ট্রপতি হইলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

1. সঠিক উত্তর দাগ (✓) দিয়া বুঝাইয়া দাও :—

(ক) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়—
মাদ্রাজে/বোম্বাই-এ/কলিকাতায়।

(খ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন—
ডব্লু. সি. ব্যানার্জী/এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম/সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃত্ব দেন—
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/অরবিন্দ ঘোষ/সূর্য সেন।

(ঘ) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়—
১৯২০ খ্রীঃ/১৯৩০ খ্রীঃ/১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

(ঙ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে "লালকোর্তা বাহিনীর" পরিচালক ছিলেন—
ডাঃ খান সাহেব/খান্ আব্দুল গফুর খাঁ/কোয়ায়ুম খাঁ।

2. **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(i) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর—ও—বিনাশ করা। বাঙালীর—কে যে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ—উৎসব পালন করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সবকিছু—করা হইল। জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য — — — গঠন করা হইল।

(ii) ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সংগ্রামের পথে চালাইবার ব্যাপারে মারাঠা নেতা — — এর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতে হয়। তাঁহার — পত্রিকা জাতীয়তাবোধের প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন — বা পূর্ণ —।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

1. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসকরা কিভাবে দেখিয়াছিল ?
2. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল ?
3. 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী' কাহাদের বলা হইত ?
4. 'বয়কট' ও স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের কি ভূমিকা ছিল ?
5. বালগঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কি জান ?

6. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?

7. ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

8. অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

9. খিলাফৎ আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান ?

10. ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসে কবে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয় ?

11. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার 'স্বরাজ্য দল' সম্বন্ধে কি জান ?

12. দেশের স্বাধীনতার জন্য জওহরলাল নেহরুর অবদান আলোচনা কর।

13. "আজাদ হিন্দ ফৌজের" স্রষ্টা হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

14. সূর্যসেন ও বিনয়-বাদল দীনেশ সম্বন্ধে কি জান ?

15. গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধে কি জান ?

16. ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বিবরণ দাও।

17. "ভারত ছাড়" আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান ?

18. "ক্যাবিনেট-মিশন" সম্বন্ধে কি জান ?

19. টীকা লিখ :—ক্ষুদিরাম, রাসবিহারী বসু, ভগৎ সিং, জালিয়ানওয়ালাবাগ, স্বরাজ্য পার্টি, খান আব্দুল গফুর খাঁ, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, আবুল কালাম আজাদ, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

1. ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কারণগুলি আলোচনা কর।

2. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা কর।

3. স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত কি লইয়া হইয়াছিল ? এই আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দাও।

4. ভারতবাসী তথা বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

5. ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান আলোচনা কর।

6. ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের (১৮৮৫-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) ইতিহাস লিখ।

7. মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের বিবরণ দাও।

8. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ২য় পর্যায়ের ইতিহাস লিখ।

9. ভারতের মুক্তি আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা আলোচনা কর।

10. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

অষ্টম অধ্যায়

ভারত ও ভারতবাসীর উপর পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাব

প্রাচীনকালে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকায় এক দেশের সহিত আর এক দেশের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত না। একমাত্র দুঃসাহসিক বণিক, ভ্রমণকারী বা অভিযানকারীর মাধ্যমেই অন্য দেশের সহিত পরিচয় হইত। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যতই সহজ হইতে লাগিল ততই এক দেশের সহিত আরেক দেশের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। এই ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া এক দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও অন্য দেশের উপর পড়িতে আরম্ভ করিল। পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রভাব ভারত ও ভারতবাসীর উপরও পড়িয়াছে। সেই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কখনও দ্রুত হইয়াছে, কখনও ধীরে ধীরে হইয়াছে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ হইয়াছিল ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহারই ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ব্রিটিশরাজের অধীন। এই অংশের মধ্যে ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ ছিল এবং সেগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রায় স্বাধীন রাজ্যের মতই চলিত। ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি হিসাবে এক একজন গভর্নর এক একটি উপনিবেশের শাসনকর্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা শুধু মাত্র নামেই। নিয়ম ছিল যে এই সব রাজ্যের আমদানি-রপ্তানি হইবে ইংলণ্ডের মাধ্যমে। কিন্তু সেই নিয়মও বিশেষ কাজে পরিণত হইত না।

এই উপনিবেশগুলির এরূপ স্বাধীনভাবে চলার উপর প্রথম আঘাত আসিল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে। তখন হইতে শুধু আমদানি-রপ্তানির নিয়মেই যে কড়াকড়ি হইল তাহা নহে, এক নূতন আইন করিয়া ইংলণ্ড-রাজ এই উপনিবেশগুলি হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্বে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্টের যে প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা এই উপনিবেশবাসীদের কাছ হইতে আদায় করিবার জন্য 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' (Stamp Act) নামে এক আইন চালু হইল। এই আইন অনুসারে উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন দলিলপত্র সম্পাদিত হইলে তাহার জন্য বিশেষ ট্যাক্স দিবার ব্যবস্থা হইল। উপনিবেশগুলি এই আইন মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। তাহারা দাবি তুলিল যে, ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টে যখন তাহাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নাই, তখন

পার্লামেণ্টেরও তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইবার অধিকার নাই। ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টেও ইহা লইয়া তুমুল আলোড়ন হয়। পিট, এডমণ্ড বার্ক প্রভৃতি নেতাগণ উপনিবেশবাসীদের পক্ষ হইয়াই লড়িয়াছিলেন। ইহার ফলে এই আইন বাতিল হইয়া গেল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য উপনিবেশগুলিতে চা প্রভৃতি আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইল। উপনিবেশবাসীরা ইহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাইল। উপনিবেশবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া চা-বোঝাই জাহাজ হইতে চা-এর বাক্স জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বোস্টন বন্দরে এইরূপ একটি ঘটনা হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ম্যাসাচুসেটসের শাসনাধিকার কাড়িয়া লইল। ইহার পরই আরম্ভ হইল ঔপনিবেশিকদের প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার যুদ্ধ। তেরটির মধ্যে বারটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা সমবেতভাবে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিল যে, তাহাদের সমস্ত পূর্ব অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই চরমপত্রে কোন ফল না হওয়ায় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলাডেলফিয়া শহরে উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা এক বিশেষ কংগ্রেসে মিলিত হইয়া ব্রিটিশ সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। স্বাধীনতার এক ঘোষণা বাণীতে জানান হইল যে, স্বাধীনতা, জীবনধারণ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং প্রত্যেক দেশের সরকার সেই দেশের জনসাধারণের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। এই ঘোষণার ভিত্তিতে আরম্ভ হইল স্বাধীনতার যুদ্ধ। জর্জ ওয়াশিংটনের সুযোগ্য নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকদের সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল। অনেক দিন ধরিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া মার্কিন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

ভারতের উপর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব : আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধকালে ভারতবাসীর উপর তাহার বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নাই। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন পাশ্চাত্য দেশের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিল তখন হইতেই আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতি বিশ্ব-ঘটনাবলীর দিকে ভারতীয়দের সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িল। রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাংলায় যে নব-জাগরণ আসিয়াছিল তাহার মধ্যে এইসব ঘটনার প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবই পরে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের মধ্য দিয়া।

ফরাসী বিপ্লব

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতেই পড়িয়াছিল। রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অবসান করিয়া জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার গঠনের ভাবধারাই ফরাসী বিপ্লবের মূলকথা।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ফরাসী রাজতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল যেমন স্বৈরাচারী তেমনই অত্যাচারী। আগে শাসন-বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য একটা প্রতিনিধি সভা ছিল, পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজাই হইয়া উঠিয়াছিলেন সর্বময় কর্তা। এই অবস্থার মধ্যেও ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই দেশের দিকে কিছুটা নজর দিতেন। কিন্তু তাঁহার পরে যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই রাজা হইলেন, তাঁহারা দেশ সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারীদের হাতে পড়িয়া দেশের অবস্থা হইল শোচনীয়। শুধু সামন্তবংশীয় অভিজাত ও ধর্মযাজকদেরই ষোল আনা সুবিধা হইতে লাগিল। দেশের আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, বিচার প্রহসনে পরিণত হইল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল। দেশে স্পষ্টভাবে দুই শ্রেণী দাঁড়াইয়া গেল। একদিকে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়, যাহারা শুধু সব সুযোগ-সুবিধার অধিকারীই নহে, ট্যাক্সের দায় হইতেও তাহারা প্রায় মুক্ত। অন্যদিকে শ্রমজীবী ও কৃষক হইতে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যন্ত সকলে সুযোগ-সুবিধা হইতেও বঞ্চিত, আবার করভারের অধিকাংশ বোঝাও তাহাদের বহন করিতে হইতেছে। এই শ্রেণীর বিক্ষোভ প্রচণ্ড হইতে লাগিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

ঠিক এই সময়েই রুশো, ভল্টেয়ার, মন্টেস্কু প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিক মনীষিগণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে এক নব ভাবধারা প্রচার করিতেছিলেন। রাজতন্ত্র ও যাজক অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা লেখার মধ্য দিয়া প্রকৃত গভর্নমেণ্টের রূপ সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনা গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, গভর্নমেণ্ট উপর হইতে তৈরি করা কোন শক্তি নহে, জনসাধারণের মতামত লইয়াই গভর্নমেণ্টকে চলিতে হইবে এবং যে গভর্নমেণ্ট তাহা না করে তাহাকে অপসারণ করার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই নব ভাবধারাই বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টি করিল।

রাজা ষোড়শ লুই অবস্থা দেখিয়া বহুদিনের বন্ধ-থাকা জনপ্রতিনিধি সভা ডাকিলেন। অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিরা এই সভাকে ন্যাশনাল এসেমব্লি রূপে গঠন

করিয়া নিজেদের পথে অগ্রসর হইলেন। ষোড়শ লুই তাহাতে বাধা দিলেন। ইহারই ফলে আরম্ভ হইল বিপ্লব। ১৭৮৯-সালের ১৪ই জুলাই প্যারিসের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া বাস্তিল দুর্গ-কারাগার আক্রমণ করিয়া দখল করিল ও সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিল। এই দিনটিকেই বর্তমানে ফরাসী-বিপ্লবের দিন হিসাবে পালন করা হয়। পরে বিপ্লবীগণ ক্ষমতা দখল করিয়া রাজা ও তাঁহার পত্নীকে বন্দী করিয়া মৃত্যুদণ্ড দিলেন ও নূতন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিলেন। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী—ইহাই হইল এই নূতন রাষ্ট্রের আদর্শ।

ভারতের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব : ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাবও ভারতে সরাসরি পড়ে নাই। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের যে আদর্শ, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর যে বাণী ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া প্রচারিত হয় তাহা ভারতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করে অনেক পরে। আগেই বলা হইয়াছে যে, ইংরেজী-শিক্ষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্ত্য দেশের অগ্রগতির ধারার সহিত ভারতবাসী পরিচিত হইয়াছে। সেই পরিচয় হইতেই ফরাসী বিপ্লবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভারতবাসীর মনে জাগিতে লাগিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরু হইতে ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যে সংগ্রামশীল ধারা গড়িয়া উঠিল তাহা ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত।

শিল্প-বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইংলণ্ডে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হইয়াছিল। এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে জিনিসপত্র উৎপাদনের পদ্ধতিতে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। মানুষের পরিশ্রম সহজ হইয়া গেল, অল্প সময়ে বেশী শিল্পদ্রব্য উৎপাদন হইতে লাগিল। যন্ত্রের সাহায্যে অনেক মানুষ মিলিয়া কাজ করিবার সুবিধা হওয়ায় উৎপাদন খরচও যেমন কম হইল, তেমনই প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল। এই পদ্ধতিতেই গড়িয়া উঠিল শিল্প বা কারখানা। উৎপাদন পদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তনকেই শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। ইংলণ্ড হইতে শুরু করিয়া ক্রমশঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই পদ্ধতি ছড়াইয়া পড়িল।

যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন-পদ্ধতির এই পরিবর্তন যে হঠাৎ হইয়াছিল তাহা নহে। ইহার পিছনে দুইটি বৈষয়িক কারণও ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতেই অনেক নূতন নূতন দেশে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল। ফ্রান্সের অধিকৃত অনেক উপনিবেশও ইংলণ্ডের হাতে

আসে। এই সমস্ত নূতন দেশগুলি হইতে সস্তায় কাঁচামাল লইয়া আসিয়া পণ্য-উৎপাদন করার সুযোগ হইল। আবার সেই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার নূতন বাজার হিসাবেও সেই দেশগুলিকে ব্যবহার করা গেল। সুতরাং সহজে প্রচুর পণ্য-উৎপাদনের দরকার হইয়া পড়িল। আবার এদিকে ইংলণ্ডের মধ্যেও ভূমিব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ফলে অনেক কৃষি-শ্রমিক বাড়তি হইয়া শহরে অন্য কাজের জন্য আসিতে লাগিল। ইহাদের কাজে লাগাইতে হইলে কল-কারখানা দরকার। এই দুই কারণেই দ্রুত প্রচুর উৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল।

বাষ্পীয় শক্তি ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার হইতেই যন্ত্রচালিত উৎপাদন শুরু। বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রথম তৈরি করেন জেমস্ ওয়াট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পর রেলইঞ্জিন নির্মিত হয় স্টিভেনসনের দ্বারা। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ফলেই স্টীমার, রেলগাড়ি প্রভৃতি উদ্ভাবন হয়। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও চলে। বস্ত্রশিল্পে নূতন যন্ত্রপাতির দ্বারা অল্প সময়ে প্রচুর বস্ত্র উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হয় ইংলণ্ডে। রেল, স্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে চতুর্দিকে পণ্য-চলাচলেরও



জেমস্ ওয়াট

সুবিধা হইল, ব্যবসায়ের প্রসারও হইতে লাগিল। যন্ত্রশক্তির ক্রমোন্নতির ফলে নূতন নূতন শিল্পেরও উদ্ভব হইতে লাগিল। লৌহ গলাইবার চুল্লী আবিষ্কার লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প গঠনে যুগান্তর আনিল। খনির কাজের জন্য যন্ত্র তৈয়ারি হইল। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য পীচ আবিষ্কৃত হইল, কৃষিকার্যের জন্যও উন্নত যানের যন্ত্র তৈয়ারি হইল। গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফোটোগ্রাফী, উন্নত ধরনের ছাপাখানা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল এবং এগুলি সবই শিল্পকে সাহায্য করিল। সব মিলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় এক নূতন রূপ দেখা দিল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতেও আসিল পরিবর্তন। নূতন নূতন জিনিস ব্যবহার করিতে পারিয়া মানুষের শ্রমের কিছু লাঘব হইল, জীবন কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হইল। যোগাযোগের সুবিধার জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। সব মিলিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামাজিক জীবনে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। একদিকে শিল্পের মালিক হিসাবে দেখা দিল এক পুঁজিপতি শ্রেণী, অন্যদিকে দেখা দিল তাহাদের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী। শিল্প-মালিকদের লাভের স্বার্থের সঙ্গে শিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও অধিকারের বিরোধ দেখা দিল। আজ সমাজ-জীবনে এই বিরোধই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

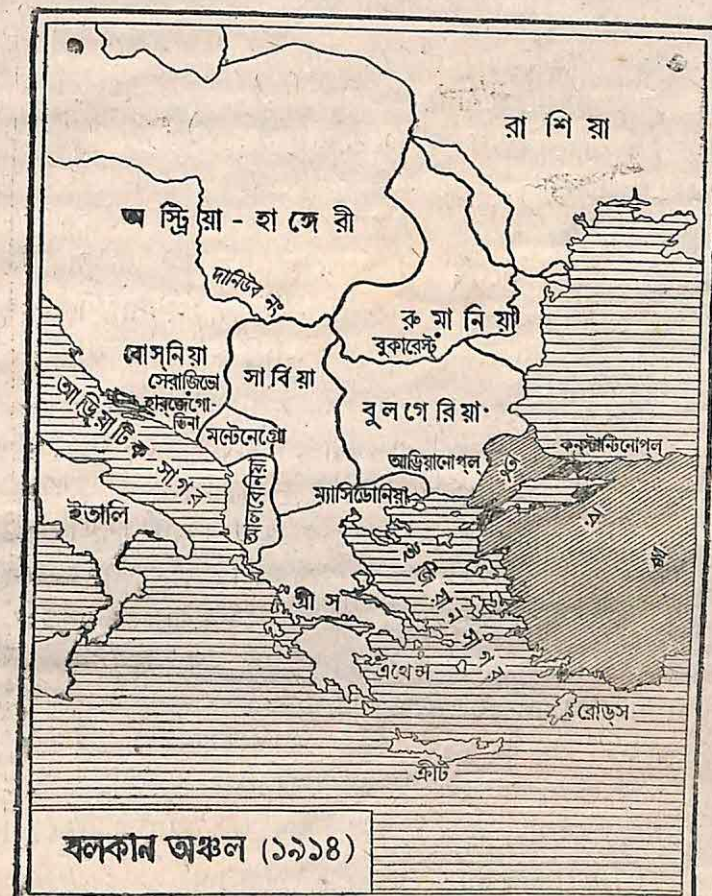
ভারতের উপর শিল্প বিপ্লবের ফলাফল : ইংলণ্ডে যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হইয়াছে তখন ভারতে ব্রিটিশ-শাসন ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে। শিল্প-বিপ্লবে ইংলণ্ডের যে বৈষয়িক স্বার্থের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহাই তখন পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগান হইল ভারতে। ইংলণ্ডের শিল্পের জন্য ভারত হইতে সস্তায় কাঁচামাল লইয়া যাওয়াই হইল ইংরেজরাজের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসাবেও ভারতকে ব্যবহার করার সুযোগ হইল। এই দুই কারণে ভারতের নিজস্ব যে উন্নত কুটিরশিল্প ছিল তাহা ধ্বংস হইল। ভারতের তাঁতশিল্প ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভারতীয় সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র, মসলিন, রেশমবস্ত্র প্রভৃতির চাহিদা ছিল সারা পৃথিবীতে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে যন্ত্র-প্রস্তুত বস্ত্রাদি আনা হইতে লাগিল ভারতে বিক্রয়ের জন্য। দামে সস্তা বলিয়া ইহার কাছে ভারতীয় তাঁতবস্ত্র প্রতিযোগিতায় হটিয়া গেল। ভারতের কুটিরশিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যও ইংলণ্ডের প্রস্তুত পণ্যের কাছে প্রতিযোগিতায় মার খাইতে লাগিল। এইভাবেই ধীরে ধীরে ভারতের বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য কুটির শিল্প উঠিয়া যাইতে লাগিল। সহজে যাহা উঠিয়া যায় নাই তাহাকে জোর জুলুম করিয়াও বন্ধ করা হইয়াছিল। ঢাকার মসলিন কাপড়কে যখন প্রতি-যোগিতায় হারান গেল না তখন তাঁতীদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে ভারতের বস্ত্রশিল্প উঠিয়া গিয়া এখান হইতে তূলা, রেশম প্রভৃতি সস্তায় ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া তাহা হইতেই উৎপন্ন দ্রব্য এখানে আবার আনিয়া বিক্রয় করা হইতে লাগিল। ভারতে যে রেলচলাচলের বিস্তার করা হইয়াছিল তাহারও মূল উদ্দেশ্য ছিল কাঁচামালের ও বিলাতী পণ্যের চলাচলের সুবিধা। ভারত ইংলণ্ডের একটি

লাভজনক বাজারে পরিণত হইল। প্রচুর সোনা-রূপা এখান হইতে চলিয়া গিয়া ইংলণ্ডে জমা হইতে লাগিল। ভারত দরিদ্র দেশে পরিণত হইল।

কিন্তু এই সর্বনাশা ফল সত্ত্বেও শিল্প-বিপ্লবের একটা সাধারণ গুরুত্ব আছে। ইংরেজদের সহিত স্বার্থের সংঘাত হইলেও পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের নিজস্ব শিল্পও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রীঃ)

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইহাকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয় এই-জন্য যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় দেশগুলি এই যুদ্ধে জড়িত হইয়া



বলকান অঞ্চল (১৯১৪)

পড়িয়াছিল। একদিকে ইউরোপের ক্ষমতাশালী দেশ হিসাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া এবং অপর দিকে জার্মানী ও তাহার সহিত অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক

এই যুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই রকম ব্যাপক যুদ্ধ আগে কখনও হয় নাই। মারণাস্ত্র ও ধ্বংসলীলা উভয় দিক দিয়াই এই যুদ্ধ পূর্বেকার সমস্ত যুদ্ধকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কামান ছাড়াও ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান এই যুদ্ধেই প্রথম ব্যবহৃত হয়।

এই যুদ্ধ হঠাৎ হয় নাই। ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল অনেকদিন ধরিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতেই ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির মধ্যে ক্ষমতাবিস্তারের ঝোঁক লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। জার্মানী ও ব্রটেন এই দুই দেশই ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়েই নিজ নিজ সামরিক শক্তি বাড়াইতেছিল। জার্মানীর সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের ক্ষমতা-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এমন উগ্র হইয়া উঠিল যে, তাহা সকলের কাছেই ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইল। পূর্বদিকে বলকান রাজ্যগুলিতে ও উত্তর আফ্রিকার তুরস্ক পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জার্মানা, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর সহিত চুক্তি করিল এবং বিশেষভাবে অস্ট্রিয়াকে বলকান অঞ্চলে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিল। জার্মানীর এই অভিযানে প্রথম শঙ্কিত হইল রাশিয়া, কেননা ইহাতে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর এলাকায় তাহার প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। কাজেই রাশিয়া তাড়াতাড়ি জার্মানীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেনের সহিত মৈত্রী-চুক্তি করিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের সংলগ্ন দুএকটি অঞ্চল লইয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বার্থ-বিরোধ চলিতেছে অনেকদিন হইতে। ইহার জন্য ফ্রান্সও বৃটেনের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করিয়াছিল। এইভাবে ইউরোপে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী দাঁড়াইয়া গেল এবং এমন অবস্থা হইল যে, যে কোন উপলক্ষ্য পাইলেই দুইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

এই উপলক্ষ্যই ঘটিয়া গেল ১৯১৪-এর জুন মাসে। জার্মানপক্ষীয় অস্ট্রিয়ার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ফার্ডিনাণ্ড সার্ভিয়া রাজ্যের মধ্যে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ইহার জন্য সার্ভিয়াকে দায়ী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সার্ভিয়া জার্মান-বিরোধী। কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া দাঁড়াইল সার্ভিয়ার পক্ষে আর জার্মানী ও তুরস্ক দাঁড়াইল অস্ট্রিয়ার পক্ষে। এইভাবে শুরু হয় যুদ্ধ। ১৯১৮-এর নভেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। জার্মানীর পরাজয়ের পর ভার্সাই চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা এই যুদ্ধ শেষ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অবস্থা আগেই আলোচিত হইয়াছে।

জাতিসংঘ (League of Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড মানুষকে এতই হতভম্ব করিয়াছিল যে এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধের হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার চিন্তা

সকলের মনে জাগিল। রাষ্ট্রনেতাগণ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণের জন্য আগ্রহী হইলেন এবং তাহারই ফলে গড়িয়া উঠিল জাতিসংঘ বা লীগ অব্ নেশনস্ (League of Nations)। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন লীগ অব্ নেশনস্ গঠনের পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসার ব্যবস্থা করা। যদিও লীগ অব্ নেশনস্-এর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নহে, তবু এই আশা লইয়া ইহা গঠিত হইল যে, সকলের যদি আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে তাহা হইলে কোন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রয়োগের ঝোঁক হইলে তাহা বন্ধ করা যাইবে।

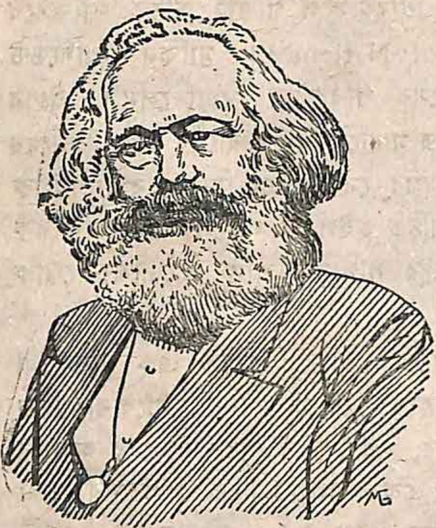
লীগ অব্ নেশনস্-এ চৌদ্দ দফা শর্তের ভিত্তিতে গঠিত এক চুক্তিনামা (Covenant) রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মূল বিষয় হিসাবে রহিয়াছে সকল দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধের অবসান ও অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের নীতি অনুসরণ এবং একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের দ্বারা তাহা কার্যকর করা। সংগঠন হিসাবে লীগ অব. নেশনস্-এর একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি পরিষদ (Council) ও একটি কেন্দ্রীয় দপ্তর (Secretariat) ছিল। তাহা ছাড়াও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রমিক সমস্যাদি বিষয়ে বিবেচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাও (I. L. O) গঠিত হইয়াছিল।

অনেক আশা লইয়া লীগ অব্ নেশনস্ গঠিত হইলেও ইহা ফলপ্রসূ হয় নাই। কেননা প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। আমেরিকা লীগ অব্ নেশনস্ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও ইহাতে যোগ দেয় নাই। জার্মানী ও রাশিয়াকে প্রথমে সদস্যপদ দেওয়া হয় নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিও নিজ নিজ সুবিধার দিকেই বেশী নজর দিয়াছিল। কাজেই লীগ অব্ নেশনস্ এমন কোন দৃঢ় ব্যবস্থা লইতে সাহসী হয় নাই যাহার দ্বারা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সাধারণভাবে অস্ত্রহ্রাসের বিষয় আলোচনার জন্য লীগ অব্ নেশন্সের উদ্যোগে কয়েকবার সম্মেলন হইয়াছিল। এই সব সম্মেলনে কিছু ফল হইলেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ফলে লীগ অব্ নেশন্স-এর উপর ছোট দেশগুলির আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ)

পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ-বিপ্লব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বরের এই বিপ্লব রুশদেশের শাসন-ব্যবস্থার আমূল

পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দেশের সমাজ ব্যবস্থাকেই এমন-ভাবে পরিবর্তন করিয়াছে যাহাতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পথ বন্ধ হয় ও সকল মানুষের উন্নতির সুযোগ লাভ হয়। এই জন্যই রুশ-বিপ্লবের গুরুত্ব শুধু রুশ দেশের পক্ষেই নহে, সমগ্র পৃথিবীর মানুষই এই বিপ্লবকে তাহাদের নূতন ভবিষ্যৎ রচনার শুভ সূচনা বলিয়া মনে করে।



কার্ল মার্কস

রুশদেশে আগে ছিল জারের শাসন। জারতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই জারতন্ত্রের আমলে দেশের কিছুটা উন্নতি হইলেও জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে দেশের অবস্থা প্রচণ্ড সংকটজনক হইয়া পড়িল। এই অবস্থাতেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে জারও নির্মম অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের ফলে জার শাসন ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। একটা জাতীয় প্রতিনিধি সভা গঠিত হইল। কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি তাহাতে না থাকায় অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় জন-সাধারণের অবস্থার ক্রমাবনতি হইতে লাগিল। তাহার পর আসিল



লেনিন

বিশ্বযুদ্ধ। রাশিয়া ইহাতে জড়িত হওয়ার ফলে সব দিক দিয়া জনসাধারণের উপর যুদ্ধের বোঝা চাপিল। দেশে খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রমিক, সৈন্যদল ও জনসাধারণের শক্তিতে এক বিপ্লবী অভ্যুত্থান হইল, যাহার ফলে জার-তন্ত্রের অবসান হইল এবং এক অস্থায়ী প্রতিনিধিমূলক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই গভর্নমেণ্টের পরিচালনা ধনিক শ্রেণীর হাতে থাকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন আমূল সংস্কারের চেষ্টা হইল না এবং জনসাধারণের দুর্দশারও কোন লাঘব হইল না। জনসাধারণ আমূল পরিবর্তনের জন্য তখন উন্মুখ হইয়া আছে। এই অবস্থায় কয়েক মাসের মধ্যেই ৭ই নভেম্বর আবার বিপ্লব হইল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি মার্কসবাদে বিশ্বাসী **বলশেভিক পার্টির** পরিচালনায়। **লেনিনই** ছিলেন এই বিপ্লবের নেতা। এই বিপ্লবের ফলে সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হইল। কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় সব কিছুর মালিকানা সরকারের হাতে আসিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় শোষণের পথ বন্ধ হইল। সামাজিক নীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সবই নূতনভাবে তৈয়ারি হইল, যাহাতে শোষক শ্রেণীর আধিপত্যের কোন সুযোগ না থাকে, শ্রমজীবী জনসাধারণের দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে। ইহাই হইতেছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হইল।

ভারতের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাবঃ রুশ-বিপ্লবের প্রভাব সমস্ত বিশ্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দেশের মানুষই এই বিপ্লব হইতে মুক্তি-আন্দোলনের নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে। ভারতেও রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়িয়াছে প্রথম হইতেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিতে দেরী হইলেও রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দেই। সেই সময় তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় রুশ-বিপ্লবের নেতা লেনিনকে অভিনন্দিত করিয়া প্রবন্ধ লিখেন। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিও রুশ-বিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে পত্র পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। বিংশ দশকের মধ্যভাগ হইতে ভারতীয় যুবকদের মধ্যে রুশ-বিপ্লবের আদর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। বিপ্লব-বাদীদের অনেকে এই আদর্শের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। বিশেষভাবে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মিগণ এই আদর্শে নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর জওহরলাল নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহাদের লেখার মাধ্যমে দেশ-বাসীকে তাহা জানাইলেন। এইভাবেই রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ভারতে বাড়িতে লাগিল এবং উহা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ প্রেরণা হইয়া উঠিল।

চীনের বিপ্লব

চীনে বহুদিন হইতেই ছিল মাঞ্চু সম্রাট বংশের শাসন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবের মাধ্যমে সেই অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া চীন প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়। সান-ইয়াৎ-সেনই জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাই তিনি এক নূতন চীন গঠনের জন্য দেশের প্রকৃত প্রগতিশীল শক্তি-সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। রুশ-বিপ্লবের সময় চীনে কমি-উনিস্ট শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল।



সান-ইয়াৎ-সেন

সান ইয়াৎ-সেন কুয়োমিনটাং দলের সহিত কমিউনিস্ট শক্তিকে মিলিত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে চীন প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছিল।

কিন্তু ১৯২৫-এ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিনটাং দলের নূতন নেতা চিয়াং কাইশেক অন্য পথে চলিতে লাগিলেন এবং কমিউনিস্টদের সহিত তাঁহার বিরোধ দেখা দিতে লাগিল। সেই বিরোধ ক্রমশঃ এমন প্রচণ্ড হইল যে চিয়াং কাইশেক দেশের অপরাপর কমিউনিস্ট-বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া কমি-উনিস্টদের ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। এই অবস্থায় সুযোগ বুঝিয়া সাম্রাজ্যবাদীরাও চিয়াং কাইশেকের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিল।



চিয়াং কাইশেক

চীনের কমিউনিস্টরা তখন মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ। তাহাদের বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী সুদক্ষ ও শক্তি সম্পন্ন। জনগণের বিরাট অংশও কমিউনিস্টদের প্রভাবে আসিয়াছে। চীনের অনেক অঞ্চল কমিউনিস্টদেরই আয়ত্তাধীন। এই অবস্থাতেই সারা চীনে কুয়োমিনটাং বনাম কমিউনিস্ট গৃহযুদ্ধ চলিতে লাগিল। চীনের এই অভ্যন্তরীণ

সংকটের সুযোগ লইয়া জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া দখল করিল ও ক্রমশঃ চীনের ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কুয়োমিনটাং সরকার কমিউনিস্ট দমনেই বেশী ব্যস্ত, জাপানকে প্রতিরোধ করিবার কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। অথচ সমগ্র জাতি জাপ-প্রতিরোধের জন্য উন্মুখ। কমিউনিস্টরা গৃহযুদ্ধ ভুলিয়া মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য কুয়োমিনটাং-এর সহিত সহযোগিতা করিল। অবস্থার চাপে পড়িয়া কুয়োমিনটাংকেও সেই পথে আসিতে হইল। এই ঐক্যবদ্ধ জাপ-প্রতি-রোধের সংগ্রামে কমিউনিস্ট বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল এবং ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে জাপানও হাত মিলাইল, তখন চীনের জাপ-বিরোধী যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধেরই অংশ হইয়া গেল। এই সুযোগে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠতাও অনেক বেশী হইল। ১৯৪৫-এ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইলে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট হইয়া চিয়াং কাইশেক আবার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরাও প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সমগ্র দেশের জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হইল এবং ১৯৪৯-এ কুয়োমিনটাংকে উৎখাত করিয়া কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করিল। চিয়াং কাইশেক তাঁহার দলবল লইয়া ফরমোজায় পলাইয়া গেলেন। মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনে জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতের উপর চীনের বিপ্লবের প্রভাব ঃ চীনের এই সকল বিপ্লবে ভারতে গভীর উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কেননা ভারতও তখন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। চীন শুধু ভারতের প্রতিবেশী নহে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ। চীন ও ভারত দুই দেশ মিলিয়া যদি স্বাধীনতা ও শান্তির নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ রচনায় তাহা বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করিবে। চীনের সহিত একযোগে ভারত এইভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্দুং-এ ভারত ও চীনের নেতৃত্বে এশিয়ার দেশগুলির সম্মেলন হইয়াছিল। ভারতবাসী তথা সারা এশিয়াবাসীর মনে ইহাতে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই অবস্থা উল্টাইয়া গেল চীনের রাষ্ট্রনেতা মাও-সে-তুং-এর সংকীর্ণ নীতির ফলে। চীন-ভারত মৈত্রী বৃদ্ধির বদলে সীমানার প্রশ্ন লইয়া চীন ভারতের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। ইহার পর হইতে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে চীনের সংকীর্ণ নীতি ভারতের কাছে একটা স্থায়ী সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ভার্সাই শান্তি চুক্তি হয় তাহাতে জার্মানীকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পরাজিত পক্ষ হিসাবে তখন তাহা জার্মানী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তখন হইতেই ইহার বিরুদ্ধে জার্মানীর একটা প্রতিশোধ স্পৃহা গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহার পরে জার্মানীতে গড়িয়া উঠে হিট্‌লারের নাৎসি দল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দল জার্মানীতে শাসন-ক্ষমতায় আসে। নাৎসি দলের নীতি ছিল এক উগ্র জাতিদম্ভের নীতি। জার্মানীর ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে হইবে শুধু ইহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, নাৎসি দল মনে করিত জার্মান জাতিই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং সেই হিসাবে জার্মান জাতিরই একমাত্র অধিকার আছে সমগ্র ইউরোপ শাসন করিবার। এই মতবাদের উত্তেজনা দিয়া জার্মানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বড় অংশকে প্রভাবিত করিয়া হিট্‌লার জার্মানীতে এক কঠোর একনায়কত্বের শাসন চালাইতে লাগিলেন। ভার্সাই চুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া সর্বপ্রকার সামরিক প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন ভবিষ্যৎ অভিযানের জন্য। তাঁহার নাৎসিবাদের সহিত ইটালীর মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের মিল হওয়ায় হিট্‌লার ও মুসোলিনী দুইজনে মিলিয়া ধীরে ধীরে অন্য দেশ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। জাপানও ক্ষমতা বিস্তারের নীতি লইয়া ১৯৩১-খ্রীষ্টাব্দে চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়াছিল। এখন জার্মানী, ইটালী ও জাপান তিনের মধ্যেই আগ্রাসী নীতির একটা মিল হইল।

যুদ্ধের অবস্থা ঘনাইয়া আসিল ১৯৩৬ সাল হইতেই। ঐ বছর ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিল। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করিতে আক্রমণ চালাইয়াছিল ফ্র্যাঙ্কোর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত এবং জার্মানী ও ইটালী তাহার পিছনে সাহায্য যোগাইয়াছিল। এইভাবে হিট্‌লার-মুসোলিনীর আগ্রাসী নীতি ইউরোপের পক্ষে এমন বিপদ হইয়া উঠিল যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে করিল। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার পর ১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪১-এ জাপান পার্লহারবারে মার্কিন নৌবহরের উপর আক্রমণ করায় জাপান ও আমেরিকার মধ্যেও যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

যুদ্ধের প্রথম দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত জার্মানীর যুদ্ধ বাধে নাই। কিন্তু প্রবল শক্তিসম্পন্ন ও বিশ্বের একমাত্র সামাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াকেই হিট্‌লার ও মুসোলিনী তাঁহাদের ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড়

প্রতিবন্ধক মনে করিতেন। তাই অনতিবিলম্বেই হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। তখন এই যুদ্ধ এক সার্বিক বিশ্বযুদ্ধ হিসাবে দাঁড়াইয়া গেল, যাহার একপক্ষ হইল জার্মানী, ইটালী ও জাপান এবং অন্যপক্ষ হইল ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকাও সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। কিন্তু নিজেদের দেশরক্ষার স্বার্থেই তাহারা রাশিয়ার সহিত একযোগে হিটলারের বিশ্বগ্রাসের চেষ্টাকে প্রতিহত করিতে মনস্থ করিল।

এই যুদ্ধে প্রথম দিকে জার্মান বাহিনীর বিপুল অগ্রগতি হইয়াছিল। জার্মানী পূর্ব-ইউরোপের অনেক দেশ দখল করিয়াছিল, ফ্রান্স অধিকার করিয়াছিল, ব্রিটেনও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জার্মান-বাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে অনেকদূর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুশ বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সামনে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তাহার পর অক্ষশক্তিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রুশ রাষ্ট্রনায়ক স্তালিনের সহিত মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একযোগে এক ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়া অগ্রসর হইলেন। মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী যুক্তভাবে পশ্চিমদিক হইতে ও সোভিয়েত-বাহিনী পূর্বদিক হইতে আক্রমণ চালাইল। ইহারই ফলে ফ্রান্স মুক্ত হইল, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও মুক্ত হইল এবং সোভিয়েত বাহিনী অগ্রসর হইয়া জার্মানীর রাজধানী বার্লিন অধিকার করিল। হিট্‌লারের পরাজয় হইল। তাহার আগেই মুসোলিনীর পরাজয় হইয়াছিল। জাপানেরও পরাজয় হইল মার্কিন পরমাণু বোমার আক্রমণে। ১৯০৫ সালে এই যুদ্ধের অবসান হয় ফ্যাসিজমের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়া। এই যুদ্ধের ফলেই পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ মুক্ত হইয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দাঁড়াইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতে কিরূপ হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O.)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। মারণাস্ত্রের শক্তি এতদূর পর্যন্ত হইয়াছে যে এটম বোমার দ্বারা এক নিমেষে প্রায় লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ বিশ্বযুদ্ধ আবার হইলে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন হইয়া যাইবে গৌণ, প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইবে পৃথিবীর অস্তিত্ব অথবা ধ্বংস। সুতরাং যুদ্ধ বন্ধ করিবার চিন্তা রাষ্ট্রনায়কগণ আরও গুরুত্ব সহকারে করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার উদ্ভব হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই বৎসরে মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেণ্ট

রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে এক জাহাজে মিলিত হইয়া এক সনদ রচনা করেন যাহাকে আটলান্টিক চার্টার বলা হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠন গড়িয়া উঠে।

পূর্বেকার লীগ অব্ নেশন্‌সের অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মূল সংস্থা দুইটি। (১) সাধারণ সভা (General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)। সাধারণ সভার প্রধান কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা ও নিরাপত্তা পরিষদের নিকট এ সম্বন্ধে সুপারিশ করা। নিরাপত্তা পরিষদের কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব কার্যকর করা। যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে বা কোন যুদ্ধ শুরু হইলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব না হইতেছে, ততক্ষণ শান্তি স্থাপন সম্বন্ধে শুধু সাধারণ সভার প্রস্তাব কার্যকর হয় না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শ স্বীকার করিলেও সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাইলে তবেই নূতন কোন দেশ ইহার সদস্য হইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য যে কোন দেশ হইতে পারে না। ইহার নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী পাঁচটি বৃহৎ শক্তি, যথা আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স রাশিয়া ও চীন ইহার স্থায়ী সদস্য। ইহা ছাড়া আরও সাতটি সদস্য দেশ আছে যাহারা দুই বৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের কোন প্রস্তাব 'ভিটো' দ্বারা নাকচ করিবার অধিকার পাঁচটি স্থায়ী সভ্যের আছে। অর্থাৎ, পাঁচটি স্থায়ী সদস্য একমত না হইলে নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পাশ হয় না।

সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ ছাড়াও জাতিপুঞ্জের কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য আরও কয়েকটি সংস্থা আছে। যথা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিষদ (Social and Economic Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council) এবং মূল দপ্তর (Secretariat)। সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিষদের অধীনে কয়েকটি বিশেষ সংস্থাও আছে। যেমন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation), শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতিমূলক সংস্থা (Educational-Scientific & Cultural Organisation) প্রভৃতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রধান সচিব (Secretary General) আছেন, তাঁহার দ্বারা সদর দপ্তর পরিচালিত হয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

1. টিক চিহ্ন (√) দিয়া সঠিক উত্তর দাও :—

(i) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল —

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ☐ ১৫৭৫ ☐ ১৭৭৬ ☐ ১৭৬৭ ☐

(ii) "সামাজিক চুক্তির মতবাদের"র স্রষ্টা ছিলেন—

ভলটেয়ার ☐ রুশো ☐ মন্টেস্কু ☐ এডমণ্ড বার্ক ☐

(iii) বাষ্প শক্তিকে কাজে লাগাইবার যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন—

আর্করাইট ☐ জেমস্ ওয়াট ☐ জর্জ ষ্টিফেনসন ☐

(iv) রুশ-বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন—

কার্ল মার্কস/পিটার দি গ্রেট/ভি. আই. লেনিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ স্ট্যাম্প আইন কি বলিয়া বিরোধিতা করিয়াছিল ?

২। ঔপনিবেশিকদের "স্বাধীনতার ঘোষণায়" কি বক্তব্য তুলিয়া ধরা হইয়াছিল ?

৩। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব কি ছিল ?

৪। শিল্প বিপ্লব কাহাকে বলে ?

৫। ভারতের উপর এই বিপ্লবের প্রভাব কি হইয়াছিল ?

৬। প্রথম মহাযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল ?

৭। লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য কি ?

৮। লীগ্-অব্-নেশনস্ ব্যর্থ হইয়াছিল কেন ?

৯। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব কি ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

২। নৌ-বিদ্রোহের কারণ ও ঘটনাবলী বিবৃত কর।

৩। শিল্প বিপ্লব সম্বন্ধে কি জান ?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৫। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের বিবরণ দাও এবং ভারতের উপর উহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। লীগ্ অব্ নেশন্স্-এর গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা কর।

৭। চীন বিপ্লবের ইতিহাস বিবৃত কর।

৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

পরিশিষ্ট

বংশ তালিকা

মুঘল সম্রাট্ বংশ

- (১) বাবর (১৫২৬-৩০ খ্রীঃ)
  - (২) হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-৫৬)
    - (৩) আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
      - (৪) জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)
        - খসরু
        - পরভেজ
        - (৫) খুররম (শাহ্ জাহান) (১৬২৭-৫৯)
          - দারাশিকো
          - সুজা
          - (৬) ঔরংজেব (১৬৫৯-১৭০৭)
            - মহম্মদ
            - (৭) (বাহাদুর শাহ্)
              - (৮) (জান্দাহার শাহ)
                - (১৪) দ্বিতীয় আলমগীর
                  - (১৫) দ্বিতীয় শাহ্ আলম
                    - (১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ্
                      - (১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ [শেষ সম্রাট্]
              - আজিম্-উস্-শান
                - (৯) ফারুকশিয়ার
              - রফি-উস্-শান
                - মহম্মদ
                - (১১) রফি-উদ-দৌলা
                - (১০) রফি-উদ-দরাজাত
              - জাহানশাহ
                - (১২) মহম্মদ শাহ
                  - (১৩) আহম্মদ শাহ্
            - মোয়াজ্জেম
            - আজম
            - আকবর
            - কামবক্স
          - মুরাদ
        - শাহ্ রিয়ার
      - মুরাদ
      - দানিয়াল
    - মির্জা মহম্মদ
  - কামরাণ
  - হিন্দোল
  - আসকরি

মারাঠা রাজবংশ

শাহজী

- সইবাঈ শিবাজী = সয়রাবাঈ (১৬২৭-৮০ খ্রীঃ)
  - প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯)
    - শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) (১৭০৮-৪৯)
  - তারাবাঈ = রাজারাম = রাজসবাঈ (১৬৯০-১৭০০)
    - তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২)
      - রামরাজা (১৭৪৯-৭৭)
    - দ্বিতীয় শম্ভুজী (১৭১২-৬০)

পেশোয়া বংশ

বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০ খ্রীঃ)

- বাজীরাও (১৭২০-৪০)
  - বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-৬১)
    - বিশ্বাসরাও
    - মাধবরাও (১৭৬১-৭২)
    - নারায়ণরাও (১৭৭২-৭৩)
      - মাধবরাও নারায়ণরাও (১৭৭৪-৯৬)
  - রঘুনাথরাও (১৭৭৩-৭৪)
    - দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)
- চিমন্‌জী (১৭৯৬)

বাংলার নবাব বংশ

মুর্শিদকুলী খাঁ
(১৭০৩-২৭ খ্রীঃ)
|
কন্যা = সুজা-উদ্-দিন
(১৭২৭-৩৯)
|
সরফরাজ খাঁ
(১৭৩৯-৪০)

* * *

আলিবর্দী খাঁ
(১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ)
|
কন্যা আমিনা বেগম = জৈন-উদ্-দিন
|
সিরাজ-উদ্-দৌলা
(১৭৫৬-৫৭)

* * *

মিরজাফর
(১৭৫৭-৬০, ১৭৬৪-৬৫)
|
কন্যা ফতেমা বেগম = মিরকাশিম (১৭৬০-৬৪) | নজম্-উদ্-দৌলা (১৭৬৫-৬৬) | সৈইফ-উদ্-দৌলা (১৭৬৬-৭০)

ব্রিটিশ আমলের গভর্নর, গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়গণ

(১) বাংলার গভর্নরগণ

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭-৬০	খ্রীষ্টাব্দ
ভ্যান্সিটার্ট	১৭৬০-৬৪	„
(লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয় বার)	১৭৬৪-৬৭	„
ভেরেল্‌স্ট্‌	১৭৬৭-৬৯	„
কার্টিয়ার	১৭৬৯-৭২	„
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌	১৭৭২-৭৪	„

(২) বাংলার গভর্নর জেনারেলগণ

ওয়ারেন হেস্টিংস্‌	১৭৭৪-৮৫	খ্রীষ্টাব্দ
স্যার জন ম্যাকফারসন	১৭৮৫-৮৬	„
লর্ড কর্নওয়ালিস্‌	১৭৮৬-৯৩	„
সার জন শোর	১৭৯৩-৯৮	„
লর্ড ওয়েলেস্‌লী	১৭৯৮-১৮০৫	„
লর্ড কর্নওয়ালিস (২য় বার)	১৮০৫	„
স্যার জন বার্লো	১৮০৫-০৭	„
আর্ল-অব্‌-মিণ্টো (প্রথম)	১৮০৭-১৩	„
মার্‌কুইস্‌ অব্‌ হেস্টিংস্‌	১৮১৩-২৩	„
লর্ড আমহার্স্ট	১৮২৩-[illegible]	„
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	১৮২৯-৩৩	„

(৩) ভারতের গভর্নর জেনারেলগণ

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	১৮৩৩-৩৫	খ্রীষ্টাব্দ
সার্‌ চার্লস (লর্ড) মেট্‌কাফ্‌	১৮৩৫-৩৬	„
লর্ড অকল্যাণ্ড	১৮৩৬-৪২	„
লর্ড এলেনবরা	১৮৪২-৪৪	„
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-৪৮	„
লর্ড ডালহৌসী	১৮৪৮-৫৭	„
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৭-৫৮	„

(৪) ভারতের ভাইসরয়গণ

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮-৬১	খ্রীষ্টাব্দ
লর্ড এল্‌গিন (প্রথম)	১৮৬২-৬৪	„
সার জন লরেন্স	১৮৬৪-৬৯	„
লর্ড মেয়ো	১৮৬৯-৭২	„
লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২-৭৬	„
লর্ড লিটন	১৮৭৬-৮০	„

লর্ড রিপন	১৮৮০-৮৪	খ্রীষ্টাব্দ
লর্ড ডাফরিন	১৮৮৪-৮৮	”
লর্ড ল্যান্সডাউন	১৮৮৮-৯৪	”
লর্ড এল্‌গিন (দ্বিতীয়)	১৮৯৪-৯৯	”
লর্ড কার্জন	১৮৯৯-১৯০৫	”

ঘটনাপঞ্জী (১৪৯৭-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১৪৯৭-৯৮	খ্রীষ্টাব্দ	ভাস্কো-ডা-গামার প্রথম ভারত অভিযান
১৫১০	”	পোর্তুগীজ কর্তৃক গোয়া অধিকার
১৬০৯	”	রানী ১ম এলিজাবেথের নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ লাভ (কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা)
১৬১৩	”	জাহাঙ্গীরের নিকট ইংরেজ কোম্পানীর সনন্দ লাভ
১৬১৫	”	ইংরেজ রাজদূত সার টমাস রো’র ভারত আগমন
১৬২৭ (বা ১৬৩০)	”	শিবাজীর জন্ম
১৬৫৮	”	ঔরংজেবের সিংহাসন লাভ
১৬৭৪	”	শিবাজীর ছত্রপতি উপাধি লাভ
১৬৮০	”	শিবাজীর মৃত্যু
১৬৯০	”	কলিকাতার পত্তন
১৬৯৬	”	ফোর্ট উইলিয়ামের প্রতিষ্ঠা
১৬৯৮	”	ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী লাভ
১৭০৫	”	মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত
১৭০৭	”	ঔরংজেবের মৃত্যু
১৭৩৯	”	নাদির শাহের ভারত আক্রমণ
১৭৪০	”	আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত
১৭৪৬-৪৮	”	কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ
১৭৫০-৫৪	”	কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ
১৭৫৬-৬৩	”	কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ
১৭৬১	”	পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
১৭৬৩	”	প্যারিসের সন্ধি
১৭৬৪	”	বক্সারের যুদ্ধ
১৭৬৫	”	ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ
১৭৬৭-৬৯	”	প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
১৭৭৫-৮২	”	প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৭৮০-৮৪	”	দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
১৭৭৯-৯২	”	তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
১৭৯২	”	রঞ্জিৎ সিংহের সিংহাসন লাভ

১৭৯৩	খ্রীষ্টাব্দ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন
১৭৯৯	”	চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
১৮০৩-০৫	”	দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৮১৭-১৮	”	তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৮১৭	”	হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮২৯	”	সতীদাহ নিবারণ
১৮৩৩	”	রামমোহন রায়ের মৃত্যু
১৮৩৫	”	পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন
১৮৩৯	”	রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু
১৮৪৫-৪৬	”	প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৮৪৮-৪৯	”	দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৮৪৮	”	স্বত্ববিলোপ নীতি
১৮৫৫-৫৬	”	সাঁওতাল বিদ্রোহ
১৮৫৭	”	কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা
১৮৫৭-৫৮	”	মহাবিদ্রোহ
১৮৫৮	”	ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র
১৮৮৩	”	ইলবার্ট বিলের খসড়া প্রকাশ
১৮৮৫	”	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৯০৫	”	কার্জনের বাংলা বিভাগ এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা
১৯০৭	”	সুরাট কংগ্রেস—নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ
১৯০৮	”	অরবিন্দের গ্রেপ্তার
১৯১১	”	বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ
১৯১২	”	রাসবিহারী বসু কর্তৃক হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ
১৯১৪-১৮	”	প্রথম মহাযুদ্ধ
১৯১৯	”	রাউলাট আইন ঘোষণা—প্রতিবাদ আন্দোলন-জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড—রবীন্দ্রনাথের ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ
১৯২০	”	গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন—খিলাফৎ আন্দোলন
১৯২২	”	গয়া কংগ্রেস—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠা
১৯২৫	”	দেশবন্ধুর মৃত্যু
১৯২৯	”	ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কর্তৃক দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ
		লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

১৯৩০	খ্রীষ্টাব্দ	বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান ও অলিন্দ যুদ্ধ ; গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন ; সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ
১৯৩৪	”	সূর্য সেনের ফাঁসি ; আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার
১৯৩৫	”	ভারত শাসন আইন ঘোষণা
১৯৩৭	”	ভারত শাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচন
১৯৩৮	”	সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি
১৯৩৯	”	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ
১৯৪০	”	মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন—পাকিস্তান দাবির সমর্থন
১৯৪১	”	সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ
১৯৪২	”	“ভারত ছাড়” আন্দোলন—আগস্ট বিপ্লব
১৯৪৫	”	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান
১৯৪৬	”	আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্তি আন্দোলন ও নৌ-বিদ্রোহ
১৯৪৭	”	স্বাধীন ভারতের জন্ম—ব্রিটিশ শাসনের অবসান

25.8.88